নিখোঁজ রতন

নিখোঁজ বুডল



দেবল দেববর্মা

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
দেবদত্ত নন্দী

প্রথম প্রকাশ
ইং ১৯৬১

তিন্নি ও ইভানকে

খোকার মনের ঠিক মাঝখানে ঘেঁষে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে
সকল উদ্দেশ-হারা
সকল ভূগোল-ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে—
যেথা আসে রাত্রি দিন
সর্ব ইতিহাস-হীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া,
তারি যদি একধারে
পাই আমি বসিবারে
দেখি কারা করে আসা-যাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ।

॥ এক ॥

রতনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই বিকেলবেলা কোথায় যেন বেরুল। তারপর থেকে আর কেউ তাকে দেখেনি। শুধু চানাচুরওয়ালা অভিরাম বলল,—হ্যাঁ, সন্ধ্যের পর ছেলেটাকে হিলহাউসের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভৈরবস্থানের দিকে সে যেতে দেখেছে।

ভৈরবস্থানের নাম শুনেই অবশ্য সকলের বুক ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। রতনের বন্ধু মিলন তাদের স্কুলের মণীশদা, স্কুলডাঙার সোমেন তিনজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ভৈরবস্থানের দিকে যাওয়ার খবরটা ভাল নয়। জায়গাটা নির্জন। শহরের একপ্রান্তে। পেছনে প্রায় কাঠা দুই জায়গা জুড়ে এক আদ্যিকালের বুড়ো বট তার শাখা-প্রশাখা মেলে মোটা মোটা ঝুরির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে রাজ্যের পাখির বাসা। পাশেই রেলের লাইন। জংশন থেকে বেরিয়ে উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে ছাতনার দিকে চলে গেছে। কাছেই একটা পোল। গত পুজোর সময় এখানে দুই বন্ধু লাইনে কাটা পড়ে। আর ওই বট গাছটার ডালে এই তো কয়েক মাস আগে একটা জোয়ান ছেলে গলায় দড়ি দিয়েছিল। কথাটা মনে হতেই মিলনের বুকটা ভয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল।

না, এখনও রতনের খবর মেলেনি। রাত্তির প্রায় দশটা বাজল। সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গায় সকলে মিলে ছুটোছুটি করেছে। নতুন-চটি, স্কুলডাঙা, বি ডি আর লাইন, লালবাজার এমন কি তিন মাইল দূরের কেন্দুয়াডিহিতেও লোক গিয়েছিল। কেন্দুয়াডিহিতে রতনের এক বন্ধু সজলের বাড়ি। যদি খেয়ালের মাথায় বেড়াতে বেড়াতে

তাদের ওখানে গিয়ে থাকে ? তা ছাড়া ক্লাসে সজল ঠিক ওর পাশের সীটটিতে বসে। দুজনের পড়াশুনো, খেলাধুলো আরো নানা বিষয়ের আলোচনা হয়। সন্ধ্যের মুখে সহপাঠী গিয়ে পৌঁছোতে হয়তো দুই বন্ধু মিলে গল্পে মেতে উঠেছে। রাত্তির কত হল খেয়াল রাখেনি।

সাইকেল নিয়ে পাড়ার একজন ছুটল কেন্দুয়াডিহিতে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে সজলের বাবা বেরিয়ে এলেন। কথাটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। —কই ? রতন তো আসেনি। তা ছাড়া এই রাত্তিরবেলায় একা একা এতখানি পথ সে কেমন করে আসবে ? আর এলেও নিশ্চয় বাড়িতে বলে আসত।

শেষ পর্যন্ত থানায় একটা খবর দিতে হয়। রতনের বাবা তাই উঠলেন। মিলন বলল, —'মেসোমশাই, আমরা সঙ্গে যাই ?'

—'তোমরা আবার কেন ? এত রাত্তিরে ?'

রতনের মা নেই, বিমাতা। টানটা তাই কম। যা হয়, সতীনের ছেলের প্রসঙ্গ উঠলেই মুখ বেজার। কেবল খোঁচা দিয়ে কথা বলে।

জামাটা গায়ে দিয়ে রতনের বাবা রাস্তায় এলেন। পেছনে মিলন, মণীশ আর সোমেন।

'বেশী রাত কর না, বুঝলে ?'—কথাটা ভেতরবাড়ি থেকে রতনের বিমাতা যেন উচ্ছিষ্টের মত ছুঁড়ে মারল। ফের ব্যঙ্গোক্তি করে বলল, —'যা একখানা ছেলে তোমার ! খোঁজ নিয়ে দেখ, কোথায় কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে। থানা-পুলিস করতে গিয়ে আবার কেঁচো খুঁড়তে না সাপ বেরিয়ে পড়ে।'

কথাটা শুধু মিলনের নয়, মণীশ কিংবা সোমেন কারো ভাল লাগেনি। আসলে রতন তেমন ছেলেই নয়। ভারি মিষ্টি স্বভাব। সর্বদাই মুখে হাসি। তাই ক্লাসে সবাই ওকে ভালবাসে। সেই রতন কাউকে কিছু না বলে নিখোঁজ হয়ে যাবে, ব্যাপারটা কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

থানাটা দূরে নয়। মিনিট পনের যেতে লাগে। রতনের বাবা বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। বিমর্ষ ভাব। মা-মরা ছেলেটাকে

তিনি কখনও অনাদর করেননি। সেই ছেলে তাকে না জানিয়ে কোথাও চলে যেতে পারে এটাই যেন তাঁর মগজে ঢুকছে না। এখনও ভাবছেন রতন হয়ত কাছাকাছি কারো বাড়ি গিয়ে হঠাৎ আটকা পড়ে গেছে। আর একটু পরেই তারা নিশ্চয় ওকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবে। হয়ত ঘরে ফিরে দেখবেন, রতন মহানন্দে তার ভাই-বোনের সঙ্গে ক্যারাম বোর্ড নিয়ে খেলতে বসে গেছে।

দারোগার নাম শঙ্করলাল বীট। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কপালে একটা কাটা দাগ। মাথায় অল্প টাক। শিকারী বিড়ালের মত গোঁফ। ছাতির চেয়ে পেটের মাপ কিঞ্চিৎ বেশী। রতন নিখোঁজ হয়েছে শুনে নির্বিকার মুখে প্রশ্ন করল,—'পরীক্ষায় ফেল করেছিল বুঝি ?'

'আজ্ঞে না।'—রতনের বাবা কথাটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন।

দারোগা বলল,—'ফেল না হলেও নিশ্চয় রেজাল্ট ভাল হয়নি ? আজকাল পরীক্ষার ফলাফল হতাশ করলেও ছাত্র ছাত্রীরা নানারকম কাণ্ড বাধিয়ে বসে।'

মণীশ আর চুপ করে থাকতে পারল না। পেছন থেকে বলে উঠল,—'আজ্ঞে না স্যার। রতন ক্লাসের থার্ড বয়। অঙ্ক, জিওগ্রাফি আর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে।'

শঙ্করলাল ভ্রূ কুঁচকে একবার মণীশের আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে নিল। রতনেব বাবাকে লক্ষ্য করে বলল,—'এই ছেলেটি কে ?'

'আজ্ঞে, ওর নাম মণীশ। আমার ছেলের চেয়ে দু-ক্লাস ওপরে পড়ে। পাড়াতেই থাকে।'—রতনের বাবা জবাব দিলেন।

মিলন আর সোমেন আর একটু পেছনে দাঁড়িয়েছিল। দারোগা তাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবার আগেই রতনের বাবা বললেন,—এরা আমার ছেলের সঙ্গে পড়ে।'

—'একই সেকশনে ?'

মিলন জবাব দিল,—'আমি আর রতন বি সেকশনে আছি। সোমেন এ সেকশনে।'

—'হুঁ'।—শঙ্করলাল ভারি একটা পেপারওয়েট কাঠের টেবিলে ঈষৎ ঠুকে যেন কোন সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করল। ফের মুখ তুলে রতনের বাবাকে উদ্দেশ করে বলল,—'ছেলেকে হঠাৎ কোন কারণে মারধোর কিংবা গালমন্দ করেছিলেন?'

—'আজ্ঞে না। কোনদিন তার প্রয়োজন ঘটেনি। আপনাকে মিথ্যে বলব না দারোগাবাবু। ছেলেটার স্বভাব খুব ভাল। মুখে যাই বলুক আড়ালে ওর সৎ-মাও রতনের সম্বন্ধে ভাল ছাড়া আমাকে মন্দ বলেনি।'

—'সৎ-মা? তার মানে আপনার স্ত্রী ওর স্টেপ মাদার?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'—রতনের বাবা ঢোক গিলে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বললেন,—'তা সেও প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। তবে মা আর ছেলের সম্পর্ক নিয়ে আমাকে কোনদিন চিন্তায় পড়তে হয়নি।'

—'কিন্তু আপনি তো মশায় চিন্তায় ফেললেন।' দারোগা চোখ দুটি প্রায় কপালে তুলে বলল—'তাহলে আপনার ছেলে হঠাৎ নিখোঁজ হল কেন?'

রতনের বাবা চুপ। পেছনে মণীশ, মিলন, সোমেন, কারো মুখে কথা নেই।

শঙ্করলাল শুধোল,—'আপনার ছেলের বয়স কত?'

—'তের।'

—'তার মানে নেহাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশু। যাকে আমরা বলি গাল টিপলে দুধ বেরোয়।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ছাড়া আর কি?'

দারোগা কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বলল,—'অবিশ্যি সব ক্ষেত্রে একথা খাটে না। এই বয়সে আবার কেউ কেউ অকালপক্ক হয়ে যায়।'

রতনের বাবা বললেন,—'দেখুন, ছেলেটা হঠাৎ কেন নিখোঁজ হয়ে গেল, তার কারণ আমি বুঝতে পারছি না। তবে একথা হলপ করে বলতে পারি যে, বাড়িতে এমন কিছু হয়নি যার জন্যে রতন অভিমানে নিখোঁজ হয়ে যাবে।'

—'আপনার ছেলে পড়াশুনোতে ভাল, পরীক্ষায় থার্ড হয়েছে, তাই না ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

হাতের কাছে একটা মোটা খাতা পড়েছিল। শঙ্করলাল সেটা টেনে নিয়ে খসখস করে কি যেন লিখতে শুরু করল। ফের মাথা তুলে প্রশ্ন করল,—'কখন থেকে নিখোঁজ বলছেন ?'

—'আজ্ঞে এই বিকেলবেলা থেকে। ধরুন বেলা চারটের পর। তবে অভিরাম চানাচুরওয়ালা ওকে সন্ধ্যের সময় ভৈরবস্থানের দিকে হেঁটে যেতে দেখেছে।'

—'আই সী ! চানাচুরওয়ালাটা তাহলে আপনার ছেলেকে চেনে ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। অভিরামের চানাচুরের খুব নাম। ছেলেরা ওর চানাচুর বলতে অজ্ঞান। পকেটে পয়সা থাকলে আর রক্ষে নেই। অভিরামের চানাচুর কিনে খাবেই। তাই সকলকে ও প্রায় চেনে—মানে ছেলেরা সব ওর চানাচুর কিনে খায় তাই।'

—'আপনার ছেলেকে দেখতে কেমন ?'

—'ইয়ে স্যার, আমি বলব ?'—'ক্লাসে পড়া তৈরি থাকলে ছাত্র যেমন হাত তুলে সম্মতির অপেক্ষা করে, প্রায় তেমনি ভঙ্গি করল মণীশ।'

দারোগা কিছু বলার আগেই রতনের বাবা সায় দিলেন,—'হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি ওর মুখ থেকেই শুনুন।'

মণীশ বলল,—'রতনের বয়স তের। উচ্চতা চার ফুট সাত ইঞ্চি। গায়ের রঙ ফর্সা, মাথার চুল ঈষৎ কোঁকড়ান। কপালের বাঁদিকে একটা কাটা দাগ। সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ওই কাণ্ডটি হয়। তখন তিনটে স্টিচ দিতে হয়েছিল।'

দারোগার ভ্রূ কুঁচকে গেল—'রতনের উচ্চতা মানে হাইট কত, তুমি সেটা কেমন করে জানলে ? রতন তো আর এভারেস্ট কিম্বা 'মঁ ব্লাঁ' নয় যে তার উচ্চতা তোমার ঠোঁটের ডগায় থাকবে।'

সবিনয়ে জানাল মণীশ,—'গত সিজনে কৃষ্ণভামিনী চ্যালেঞ্জ কাপের টুর্নামেন্টে আমি রেফারী ছিলাম।'

—'কৃষ্ণভামিনী চ্যালেঞ্জ কাপ ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। গৌরহরি গড়গড়ি তেলকলওয়ালার স্ত্রীর নামে। বছর দুই আগে ভদ্রমহিলা মারা যান। তারপর বেশ কিছুদিন ধরে তেলকলওয়ালাকে প্রচুর তেল মাখিয়ে ওই চ্যালেঞ্জ কাপটা আমরা আদায় করেছি। জুনিয়রদের খেলা। চার ফুট দশ ইঞ্চি পর্যন্ত খেলুড়েরা মাঠে নামতে পারে। রতন এসেছিল সেভেন স্যাটেলাইট টিমের হয়ে খেলতে। তখন ওর হাইটটা আমি নিজের হাতে মেপে দেখেছি। একজ্যাক্টলি চার ফুট সাত ইঞ্চি।'

—'তোমার স্মরণশক্তি তো খুব প্রখর দেখছি। বেশ ইনটেলিজেন্ট লুক। হ্যাঁ, তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে এখন দেশে সত্যিকার প্রয়োজন। এমন কি আমাদের পুলিস ডিপার্টমেন্টেও।'

মিলন বাঁ হাত দিয়ে ছোট্ট একটু চিমটি কাটল মণীশের পিঠে।

—'আপাততঃ একটা জেনারেল ডায়েরি লেখা রইল।'—রতনের বাবার উদ্দেশে বলল দারোগা,—'ইচ্ছে করলে নম্বরটা আপনি নিতে পারেন। আমার মনে হয় কালকের দিনটা দেখুন। যদি কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকে, সকালে নিশ্চয় ফিরে আসবে।'

'কিন্তু যাবে কোথায় ?'—রতনের বাবার প্রশ্ন।

কয়েক সেকেণ্ড ভ্রূ কুঁচকে রইল দারোগা। বাঁ হাতটা গালে রেখে বলল চিন্তিত মুখে,—'আচ্ছা, আপনার আত্মীয়-টাত্মীয়রা সব কোথায় থাকেন ?'

—'আত্মীয় বলতে আপনি কাদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন ?'

—'এই ধরুন আপনার ভাই-বোন মানে রতনের কাকা কিংবা পিসি।'

—'আমার কোন ভাই নেই। বোনের অনেকদিন হল বিয়ে হয়ে গেছে। সে থাকে জয়পুরে।'

—'জয়পুরে ?'

—'হ্যাঁ, রাজস্থানে। এই তো পরীক্ষা দিয়ে রতন পিসির বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এল।'

—'একাই গিয়েছিল ?'

—'না। ওইটুকু ছেলে কখনও একা যেতে পারে ? আমার এক খুড়তুতো ভাই থাকে কলকাতায়। সেও বেড়াতে গিয়েছিল। রতনকে ওর সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম।'

কি যেন চিন্তা করে বলল দারোগা,—'আচ্ছা, ওর মামাবাড়ি কোথায় ?'

—'নদীয়া জেলার কেষ্টপুরে। বীরনগর স্টেশনে নেমে যেতে হয়। তা মামাবাড়ি ওই নামেই। সেখানে এখন কেউ থাকে না। দুই মামার একজন থাকে ব্যাঙ্গালোরে, আর একজন শিলিগুড়িতে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বলতে ওই বিজয়ার পর একখানা চিঠি আসে। ব্যস ! তারপর সমস্ত বছর আর সাড়াশব্দ নেই।'

ইঙ্গিতে মিলনকে কাছে ডাকল দারোগা। বললে চাপা গলায়,—'তোমার বন্ধুর সিনেমা-টিনেমার দিকে ঝোঁক ছিল কী ? এই ধর, মারপিটের হিন্দি বই ?'

মাথা নেড়ে বলল মিলন,—'না স্যর। রতন হিন্দী বই একদম দেখত না। ইংরেজী অ্যাডভেঞ্চারের বই কিংবা জঙ্গল পিকচার দেখতে ভালবাসত। তবে এই বাঁকুড়া শহরে সেরকম বই আর ক'টা আসে ? রবিবারে মর্ণিং শোতে মাঝে মাঝে দেখান হয়।'

রতনের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন,—'হঠাৎ এই সিনেমার কথাটা কেন উঠল ?'

দারোগা বলল,—'এই বয়সে ওটাই তো ছেলেদের মস্ত ব্যাধি। ধরুন তের-চোদ্দ বছর থেকে আঠারো-উনিশ বছর পর্যন্ত কেউ নিখোঁজ হলেই প্রথমে ওই সন্দেহ হয়। রাতারাতি বিখ্যাত হবে মনে করে অনেকেই তো ফিল্মে চান্স পাওয়ার আশায় বোম্বাই পাড়ি দেয় কিনা। বাপের মালকড়ি হাতিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ে।'

মণীশ বলল,—'কিন্তু রতনের সম্বন্ধে এরকম দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই।'

রতনের বাবার দিকে তাকিয়ে দারোগা বলল,—'সেই তো হয়েছে

মুস্কিল। রতন কেন নিখোঁজ হল তার কোন ক্লু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রোগের যেমন নানারকম সিমটম্ দেখা দেয়, তেমনি যে কোন ঘটনার নেপথ্যে যথেষ্ট কার্যকারণ থাকে। একটা জলজ্যান্ত ছেলে বাড়ি থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলে, তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য কিংবা মোটিভ থাকতেই হবে। সেই মোটিভ না বের করতে পারলে আপনার নিখোঁজ ছেলের সন্ধান পাওয়া খুব সহজ হবে বলে আমার মনে হয় না।

রতনের বাবা জানালেন,—'দেখুন, আমি অজাতশত্রু এমন কথা জোর গলায় বলতে পারব না। তবে আমার সঙ্গে কারো এমন শত্রুতা নেই যে ঝাল ঝাড়তে রতনকে গায়েব করে রাখবে।

দারোগা বলল,—'আপাততঃ আমাদের কিছু করবার নেই। দু-একদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে। ইতিমধ্যে রতন ফিরে না এলে তার একটা ছবি দেবেন। আমাদের মিসিং স্কোয়াডে ওটা রিপোর্ট করব। রেডিও, টি. ভি. আরো নানা জায়গায় নিখোঁজ হবার খবর প্রচার করা হবে। তাতেও কিছু ফল হতে পারে।'

মিলন বলল,—'মেসোমশায় তো কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।'

মণীশ বললে গম্ভীর মুখে,—'আমার মনে হয় ওসব বিজ্ঞাপন দিয়ে কোন লাভ হবে না। রতন বোধহয় স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হয়ে যায়নি।'

'সেকি!'—রতনের বাবা যেন আঁতকে উঠলেন।

'দেখুন মশায়,'—চোখ নাচিয়ে বললে দারোগা—'পুলিসে কাজ করছি অনেকদিন। এখন গন্ধেও খানিকটা টের পাই। নেহাৎ আপনি ছাপোষা মানুষ, চাকরিটুকু সম্বল। নইলে তো আমি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতাম, দি বয় হ্যাজ বিন কিডন্যাপড্…।'

'কিন্তু আমার ছেলেকে কিডন্যাপ্ করে লাভ কী? আমি তো আর মোটা টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ছেলেকে উদ্ধার করে আনতে পারব না।'

—'সেটাই তো চিন্তার বিষয়।'—ভ্রূ নাচিয়ে হাসল দারোগা। বলল,—'তাহলে ছেলেটাকে কিডন্যাপ করা হল কেন?'

মণীশ বললে,—'ব্যাপারটা ঠিক এমন জলবৎ তরলং মনে হয় না। একটা ছেলে উধাও হয়ে গেল মানেই তাকে টাকা পয়সার জন্য কিডন্যাপ্ করে নিয়ে গেছে, তা সঠিক নাও হতে পারে।'

—'তুমি কি বলতে চাও মণীশ?' রতনের বাবা অসহায় চোখে তাকালেন।

—'আমার ধারণা বিষয়টা খুব জটিল এবং এর শেকড় অনেক গভীরে।'

—'হয়তো তাই আর সেজন্যই চট করে কোনো ক্লু চোখে পড়ছে না।' দারোগা মন্তব্য করল। তারপর রতনের বাবাকে বললে,—'তবু লেট আস হোপ ফর দি বেটার। অন্ততঃ একটা দিন অপেক্ষা করে দেখুন। ছেলেটা যদি নিজেই ফিরে আসে।'

॥ দুই ॥

চারজনই আবার পথে নামল। ফেব্রুয়ারির শুরু, বেশ ঠাণ্ডা। রাত একটু বাড়লেই বাতাস আরো কনকনে হয়ে ওঠে। রতনের বাবা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, শুধু একটা শ্লিপওভার পরে বিকেলে বেরিয়েছিল। এই ঠাণ্ডায় বোধহয় হি-হি করে কাঁপছে।

—'তার মানে বিকেলে বেরোবার সময় রতন জানত, সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরে আসবে'—বললে মণীশ।

—'সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে রতনকে কেউ বা কারা জোর করে নিয়ে গেছে।' শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুরে বললে মিলন।

মণীশ গম্ভীর মুখে বললে,—'শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগোন ঠিক হবে না। অন্ততঃ একটা ক্লু আমাদের খুঁজে পেতেই হবে।'

সোমেন জিজ্ঞাসা করল,—'ক্লু মানে কি বল তো?'

মণীশ জবাব দিল,—'ক্লু শব্দের অর্থ সন্ধান সূত্র। সাদা বাংলায় সুতোর খেই বলতে পারিস। খেইটা হাতে এলেই যেমন টান দিলে লাটাই থেকে সুতো বেরিয়ে আসে তেমনি অপরাধের কেসে ক্লু-টা খুঁজে পেলে অপরাধীর অনুসন্ধান করা সহজ হয়ে পড়ে।'

কয়েক মুহূর্ত সকলেই চুপ। তারপর মণীশ বললে,—'রতনের পড়ার ঘরটা ভালো করে দেখা দরকার মেসোমশায়। ধরুন যদি চিঠিপত্রের কোন খোঁজ পাই।'

মিলন বললে,—'চিঠি পাওয়া গেলে বুঝতে হবে রতন ইচ্ছে করে কোথাও চলে গিয়েছে।'

—'কিন্তু ছেলেটার হাতে লেখা তেমন চিঠি কোথাও নেই।'

'রতনের মা আর বোন পড়ার টেবিল, ড্রয়ার, সব আতিপাতি করে খুঁজে দেখেছে'—বললেন ধরা গলায় রতনের বাবা।—'আমি আর ভাবতে পারছি না। চললাম।'—বলতে বলতে প্রবেশ করলেন বাড়ির মধ্যে।

মণীশ, মিলন আর সোমেন রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। আরো খানিকটা হাঁটলে তাদের বাড়ি। মিলন আর মণীশ পাশাপাশি বাড়িতে থাকে। সোমেন খানিকটা দূরে।

মণীশ বলল,—'আমার কি মনে হয় জানিস? শঙ্কর দারোগা এর কিনারা করতে পারবে না।'

—'তাহলে?'—ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মিলন।

—'নিশ্চয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে রতনকে কেউ বা কারা কিডন্যাপ্ করে রেখেছে। যদি টাকার জন্যে করে থাকে, তাহলে মেসোমশায়ের কাছে চিঠি এল বলে'—বললে মণীশ।

—'আর যদি অন্য কোন মতলবে ওকে গায়েব করে নিয়ে গিয়ে থাকে?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সোমেন।

মণীশ গম্ভীর মুখে বলল,—'সেই উদ্দেশ্যটা জানা গেলেই তো রতনকে উদ্ধার করা অনেক সহজ হত।'

সকাল ছ'টা বাজতেই দরজায় কড়া নড়ে উঠল। ঘুমভাঙা চোখে বাইরে এসে মণীশ তো অবাক। এই ঠাণ্ডায় মিলন কেন দাঁড়িয়ে? তবে কী রতন বাড়ি ফিরে এসেছে?

উদ্বিগ্ন গলায় মিলন বলল,—'খবর শুনেছ?'

—'কি খবর?'

—'কাল রাত্তিরে রতনদের বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে।'

—'চুরি!'

—'হ্যাঁ। তবে দামী জিনিসপত্তর কিছু চোঁয়নি।'

—'তাহলে? কিছু চুরি তো গেছে। রতনদের বাড়িতে চোর নিশ্চয় রাত্তির বেলা বেড়াতে আসেনি?'

—'সে কথা তো ঠিক।'

—'তাহলে চোর কি নিয়ে পালিয়েছে সেটা জানা দরকার।'

—'কিন্তু সেটাই তো এখনও বোঝা যাচ্ছে না। শুধু রতনের পড়া ঘরটা একেবারে তছনছ করে দিয়ে গেছে। মনে হয় ওর বইপত্তরের মধ্যে কি যেন খুঁজছিল।'

মণীশ গম্ভীর হয়ে গেল।

মিলন জিজ্ঞাসা করল,—'মণীশদা, রতন কি আজ ফিরে আসতে পারে?'

—'না', মাথা নাড়ল মণীশ। তাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বললে,—'আমার কি মনে হয় জানিস?'

—'কি'? মিলন জিজ্ঞাসু হল।

মণীশ বললে,—'রতন এখন বিশ বাঁও জলে। তাকে টেনে তুলতে দেখছি অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে।'

॥ তিন ॥

জামাটা গায়ে গলিয়ে মণীশ তখুনি বেরিয়ে এল। রতনদের বাড়িতে পৌঁছতে তিন মিনিটও লাগেনি। মেসোমশায় অর্থাৎ রতনের বাবা দরজার পাশে রোয়াকে বসে। তাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন,—'তাজ্জব ব্যাপার, বুঝলে? রাত্তিরে কখন পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়িতে চোর ঢুকেছে আমরা কেউ টের পাইনি। ইচ্ছে করলে ঘটি-বাটি, থালা-বাসন, আরো অনেক কিছু নিতে পারত। কিন্তু সেদিকে নজরই দেয়নি।'

পেছন থেকে মিলন বলল,—'এ বোধহয় বিদ্বান চোর, তাই সোজাসুজি রতনের পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।'

রতনের বোনের নাম স্মৃতি। ন-দশ বছরের মেয়ে। মুখে খইয়ের মত কথা ফোটে। ফুটফুটে, মিষ্টি দেখতে। সে বেরিয়ে এসে বলল, —'চোরে দাদার অনেক বই-খাতা নিয়ে গেছে।'

—'বই!'—সোমেন অবাক চোখে তাকাল।

—'বই-খাতা নিয়ে গেছে তুমি কেমন করে জানলে?'—মণীশের প্রশ্ন।

—'বা রে! দাদার পড়ার টেবিল তো আমিই গুছিয়ে রাখি। আজ সকালে গিয়ে দেখি দাদার তিনখানা বই, অ্যালজেব্রা, বিজ্ঞান আর ভূগোল লোপাট। কোথাও খুঁজে পেলাম না। অনেক খাতাপত্রও মনে হল টেবিলে নেই।'

—'এ সেই চোর বাবাজীর কর্ম, বুঝলে মণীশদা? বোধহয় মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। তাই ক্লাস নাইনের বইয়ের ওপর নজর।'

মণীশ মুখ তুলে রতনের বাবাকে লক্ষ্য করে বলল,—'মেসোমশায়, থানায় কি খবর পাঠিয়েছেন?'

—'না। মানে এই ছোটখাটো চুরি আবার মিছিমিছি থানায় জানাতে যাব?'—রতনের বাবা একটা নেতিবাচক ভঙ্গি করলেন।

মণীশ বলল,—'চুরিটা হয়ত কিছু নয় কিন্তু একটা বিষয় যে বড় ভাবিয়ে তুলছে।'

—'কী বিষয় মণীশদা?'—সোমেন প্রশ্ন করল।

—'চোর শুধু রতনের ঘরে ঢুকেই খাতাপত্র, বই-টই ঘেঁটেছে।'—মণীশ আড়চোখে এবার সকলের মুখের দিকে তাকাল।—'ইচ্ছে করলে সে নিশ্চয় থালা-বাসন, ঘটি-বাটি, এমন কি টাকা-পয়সাও সরাতে পারত। এর থেকে এটুকু বলা যায় যে আগন্তুক ঠিক সাধারণ চোর নয়।'

রতনের বাবা বললেন,—'মণীশ, তোমার কি মনে হয় ছেলেটার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে এই চুরির কোন সম্পর্ক আছে?'

—'সম্পর্ক রয়েছে, এমন একটা সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে চোর যখন শুধুমাত্র রতনের ঘরে হানা দিয়েছিল এবং তার বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বেশ কিছু বই নিয়ে গেছে।'

রতনের বাবা যেন বেশ সমস্যায় পড়ে গেলেন। বললেন,—'এ তো গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল। গতকাল বিকেল থেকে ছেলেটা নিখোঁজ। আবার রাত্তিরে তার ঘরে ঢুকে চোরে বইপত্র নিয়ে গেল।'

মণীশ বলল,—'এতে ভাবনার কিছু নেই মেসোমশায়। আপনি অনুমতি দিলে একবার রতনের ঘরটা ভাল করে পরীক্ষা করি।'

—'যাও না, গিয়ে দেখ। তোমার অনুমতি নেবার কি আছে? তবে হ্যাঁ, যে কথা তুমি বলছিলে, থানায় কি তাহলে একটা খবর পাঠিয়ে দেব?'

—'এখন থাক মেসোমশায়। একটু পরে আমি নিজেই একবার দারোগাবাবুর কাছে যাব। আসলে এই চুরিটা তো সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। রতন নিখোঁজ বলেই চুরির সঙ্গে তার নিপাত্তা হওয়ার ব্যাপারটার একটা যোগসূত্র থাকতে পারে সন্দেহ করা হচ্ছে। নইলে এটা তেমন কিছু সিরিয়াস নয়। যাই হোক, এই চুরির ঘটনা দারোগাবাবুকে আমি জানিয়ে আসব।'

মণীশ আর দেরি না করে রতনের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তার সঙ্গে মিলন আর সোমেন দুজনেই। সত্যি, জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড, বইখাতা তছনছ করে দিয়ে গেছে। একনজর তাকালেই বোঝা যায় যে চোর কোন বিশেষ মতলব নিয়ে এই ঘরে ঢুকেছিল।

মণীশ বলল,—'খবরদার! জিনিসপত্রে কেউ হাত দিস নে। পুলিস যদি এসে ফিঙ্গারপ্রিণ্ট নিতে চায় তখন সব গোলমাল হয়ে যাবে। আমি শুধু একবার বাইরে থেকে ওর খাতা-বইয়ের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি।'

টেবিলের ওপর কাগজপত্র সব ছড়ান। দু-একটা বই মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এ ঘরে যে ঢুকেছিল, সে বইপত্র হাতড়ে কি যেন খোঁজাখুঁজি করেছে। সম্ভবতঃ পেয়েছে, নয়ত পায়নি। তবে স্মৃতি বলছিল, তার দাদার তিনখানা বই আর কিছু কাগজপত্র যেন নেই। লোকটা কী বগলদাবা করে সেগুলো নিয়েই চম্পট দিয়েছে?

চটপট রতনের বইপত্রের ওপর মণীশ নজর বুলিয়ে নিল। সন্দেহ-জনক তেমন কিছু চোখে পড়ল না। এমন কি রাত্তির বেলা যারা এই ঘরে এসে ঢুকেছিল তাদের পায়ের ছাপ কিংবা অন্য কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হয়তো লোকগুলো মোজা পরেছিল। তা ছাড়া একটু আগেও এই ঘরে রতনের মা-বাবা, বোন সকলে ঘোরাফেরা করেছে। সিমেণ্টের পরিষ্কার মেঝের ওপর পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক নজর ফেলতেই ঘরের কোণে পড়ে থাকা একটি তুচ্ছ বস্তু মণীশের কৌতূহল আকর্ষণ করল। কয়েক পা এগিয়ে ঈষৎ নিচু হয়ে ওটি সে কুড়িয়ে নিল। একটা সিগারেটের প্যাকেট। তবে ব্র্যাণ্ডটা যেন নতুন লাগল। বাঁকুড়ায় কোনো দোকানে কিংবা কারো কাছে এটা দেখেছে বলে মনে হল না। মণীশ নিঃশব্দে খালি প্যাকেটটা পকেটে রাখল। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই অর্ধদগ্ধ সিগারেটের খানিকটা অংশ ফের চোখে পড়ল। মণীশ আগের মতই সেই সিগারেটের পোড়া অংশটুকুকে তুলে সযত্নে পকেটে চালান করল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে ভাবছিল। যতদূর জানে মেসোমশায় অর্থাৎ রতনের বাবা সিগারেট খান না। আর রতন ঘরে খিল দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে ধূমপান করবে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। তাহলে গত রাত্তিরে যারা এই ঘরে ঢুকেছিল, ওই সিগারেটের প্যাকেটটা তারা ফেলে গেছে। হয়তো এই ঘরে ঢোকার আগে একজন লোক সিগারেটটা ধরিয়েছিল। কাজকর্ম সেরে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আধপোড়া সিগারেটের টুকরোটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।

হঠাৎ কি খেয়াল হতে মণীশ পড়ার টেবিলের ড্রয়ারটা টানল।



ভিতরে এক রাশ জিনিস।

ভিতরে এক রাশ জিনিস। কয়েকটা চকচকে নানা রঙের মার্বেল। একটা ঝাড়-লণ্ঠনের কাচ, এক টুকরো কাঠের ওপর দাঁড় করানো

হোয়াইট মেটালের ঝকঝকে সাদা উট, পেন্সিল-কাটা কল, রবার আর একটা লাল রঙের ছোট্ট বাঁধানো খাতা উঁকি দিল। ড্রয়ারটা অল্প টেনে মণীশ সেই নোট-বুকের পাতায় ঝুঁকে পড়ল। যা ভেবেছিল তাই, ছেলেটার ডায়েরী লেখার অভ্যেস আছে। তার বুকের ভিতরটা আকস্মিক আনন্দে দুলে উঠল। হয়তো এই ছোট্ট নোট-বুকের পাতায় রতনের অন্তর্ধান রহস্যের একটা ক্লু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সোমেন আর মিলনকে কিছু না জানিয়ে সে প্রায় অন্যমনস্কের মতো গোপনে ডায়েরীর পাতাগুলি দ্রুত উল্টে যাচ্ছিল। দু-চার পৃষ্ঠায় নজর বুলোতেই হঠাৎ এক জায়গায় মণীশের দৃষ্টি আটকাল। তখুনি খাতাটা বন্ধ করে সে প্রায় শূন্যে তাকিয়ে কী যেন বিড় বিড় করল।

সোমেন জিজ্ঞাসা করল,—'কী ভাবছ বল তো?'

মণীশ দুজনকেই উদ্দেশ করে বলল,—'নাগ-পাহাড় কোথায় জানিস?'

—'নাগ-পাহাড়? নাগা-পাহাড় মানে নাগা হিলস্ নয় তো?' মিলন বললে উৎসুক গলায়।

—'উঁহু। নাগা নয়, নাগ···নাগ-পাহাড়। তবে জায়গাটা কোথায় হবে ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না।'

—'নাগ-পাহাড়ের কথা তুমি কেমন করে জানলে মণীশদা?' সোমেনের প্রশ্ন।

—'যেমন করেই হোক জেনেছি। তোরা কিন্তু এটা কারো কাছে ফাঁস করবি নে। মেসোমশায়ের সামনে একদম নয়। উনি এমনিতেই নার্ভাস হয়ে আছেন। নাগ-পাহাড়ের কথা কানে গেলে ঠিক মনে করবেন যে দুষ্টু লোকেরা রতনকে কিডন্যাপ্ করে নাগ-পাহাড়ে নিয়ে গেছে।'

—'কিন্তু ধর দারোগা এলে তাকে তো বলতে হবে।' চাপা গলায় বললে মিলন।

—'না। এখন কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। নাগ-পাহাড়ের

নামটা আমি এক জায়গায় খুঁজে পেয়েছি। আমার কেমন মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এই নাগ-পাহাড়েই নিখোঁজ রহস্যের কিনারা হবে।'

মিলন বলল,—'কিন্তু পুলিশকে সমস্ত কথা না জানালে তদন্ত হবে কেমন করে?'

মণীশ ইঙ্গিতে দুজনকে কাছে ডাকল। বলল,—'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

—'কি আইডিয়া মণীশদা?' সোমেন জিজ্ঞাসা করল।

—'রতনের পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে আমি একটা ক্লু পেয়েছি।'

—'ক্লু?'

—'হ্যাঁ। মনে হয় সেই সূত্র ধরে এগোলে রতনকে উদ্ধার করতে পারব।'

শুনে মিলন প্রায় লাফিয়ে উঠল।—'উরি বাস! তাহলে কিন্তু একদিনেই আমরা শহরে হিরো হয়ে যাব।'

মণীশ গম্ভীর মুখে বলল,—'ক্লুটা পুলিশের হাতে গেলে আমাদের আর কিছু করবার থাকবে না। ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকতে হবে। তার চেয়ে আয়, তিনজনে মিলে চেষ্টা করে রতনকে খুঁজে আনি আর ওই সঙ্গে দুষ্টু শয়তানগুলোর মুখোশ খুলে দিই।'

মিলন আর সোমেন দুজনেই এক পায়ে খাড়া। গোয়েন্দাগিরির মতো নেশা একবার মাথাচাড়া দিলে কারো কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে?

ইতিমধ্যে ছোট্ট ডায়েরী বইটা মণীশ কখন নিঃশব্দে পকেটে ভরে নিয়েছে। আগের মতো মুখ গম্ভীর করে সে বলল,—'এ কাজে অবশ্য অনেক ঝুঁকি আছে। হয়তো রতনকে উদ্ধার করতে আমাদের সেই নাগ-পাহাড়ে যেতে হতে পারে।'

—'নাগ-পাহাড়?' সোমেন বড় বড় চোখে তাকাল। বলল,—'সে তো দারুণ অ্যাডভেঞ্চার মণীশদা। আমার কী মনে হচ্ছে জানো?'

—'কী?'

—'মনে হচ্ছে আমরা যেন কঙ্গোর জঙ্গলে কিংবা আমাজনের তীরে এক গভীর অরণ্যে রতনকে খুঁজতে চলেছি।'

মিলন বলল,—'বাড়িতে কিন্তু নাগ-পাহাড়ের কথা বেমালুম চেপে যেতে হবে। আমি বলব যাদবপুরে ছোট পিসির কাছে যাচ্ছি।'

সোমেন বোঁ করে একবার ঘুরে গিয়ে বলল,—'আমি যাচ্ছি বর্ধমানে। আমার জেঠতুতো দাদা সেখানে মুন্সেফ,—বৌদি কতবার যেতে লিখেছে।'

মণীশ বলল,—'খুব সাবধান। আমাদের এই প্ল্যানের কথা যেন কাকপক্ষীতেও না টের পায়। রতনকে যারা কিডন্যাপ্ করে নিয়ে গেছে তারা রীতিমত শয়তান।'

মিলন জিজ্ঞাসা করল,—'কিন্তু মণীশদা, রতনকে কেন কিডন্যাপ্ করে নিয়ে গেল তাই তো এখনও বোঝা যাচ্ছে না।'

—'মনে হয়, রতনের কাছে এমন কিছু ছিল যেটা সংগ্রহ করতে ওদের নাগ-পাহাড় থেকে বাঁকুড়াতে ছুটে আসতে হয়েছে,' মণীশের বক্তব্য।

সোমেন বলল,—'গুপ্তধনের নকশা নয়তো? অথবা ঐ জাতীয় কিছু? কিন্তু রতন তা পেল কি করে?

—'এ সব কথা এখন থাক'—আলোচনায় ছেদ টানল মণীশ।—'হাতে এখন অনেক কাজ। প্রথমেই নাগ-পাহাড় কোথায় সেটা জানতে হবে। তারপর যারা এখানে এসেছিল তাদের সম্বন্ধে একটা খোঁজখবর নেব। রতন যখন ভৈরবস্থানের দিকে হেটে যাচ্ছিল তখন নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও তাদের আস্তানা ছিল। শংকর দারোগাকে নিয়ে এই ব্যাপারে একটা তদন্ত করতে পারলে ভাল হয়।'

॥ চার ॥

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই রতনের বাবা বললেন,—'কী ব্যাপার? ওর লেখা কোন চিঠিপত্র পেলে?'

—'না'—মণীশ মাথা নাড়ল। ফের বলল,—'তবে আপনি এত চিন্তা করবেন না মেসোমশায়। একটু পরেই দারোগাবাবুর কাছে যাচ্ছি। রতনকে আমরা যেভাবে পারি, ফিরিয়ে আনব।'

পাড়া থেকে বেরিয়ে তিনজনে এসে বোরস্টালের মাঠে বসল। এদিকটা বেশ ফাঁকা। বড় একটা ঘোড়া নিমের গাছ কোণের দিকে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে। বেলা প্রায় আটটা। শীতের রোদ্দুর গায়ে নিতে ভারি আরাম লাগে।

সোমেন বলল,—'মণীশদা, টেবিলের ড্রয়ারে কি ক্লু খুঁজে পেলে তা কিন্তু আমাদের বলনি।'

পকেট থেকে ছোট্ট ডায়েরী বইটা বের করে মণীশ বলল,—'সেটা তোদের দেখাব বলেই তো এই মাঠে এসে বসলাম।'

—'ওটা কি মণীশদা?' মিলন শুধোল।

মৃদু হেসে মণীশ জবাব দিল—'রতনের ডায়েরী। যাকে আমরা রোজনামচা বলি। তবে প্রতিদিন নিয়ম করে অবশ্য রতন কিছু লেখেনি। মনে যেদিন হঠাৎ কোনো ঘটনা নাড়া দিয়েছে, তখনই লিখেছে। এই যেমন তিন দিন আগে লেখা আছে—নাগ-পাহাড়ের সেই লোকটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। কিন্তু আশ্চর্য! ও যা বলছে তাই কি সত্যি? আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আবার ভাবছি যদি ব্যাপারটা মিথ্যে না হয় তাহলে তো আমার এখুনি হাত-পা ছুড়ে আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে হবে।'

মিলন বলল,—'আমার স্থির বিশ্বাস নাগ-পাহাড়ের সেই লোকটাই ওকে কিডন্যাপ্ করে নিয়ে গেছে।'

—'যাকে কিডন্যাপ্ বলে তেমন কিছু হয়তো প্রথমে ঘটেনি। এই যে পরদিন রতন আবার লিখেছে—আজও ওদের সঙ্গে দেখা হল। ওরা তিনজন নাকি বাঁকুড়াতে এসেছে। কিন্তু এই সামান্য কারণে ওরা সেই নাগ-পাহাড় থেকে এতদূর ছুটে এলো ? আমার যেন মনে হয় এর মধ্যে একটা গভীর রহস্য আছে। তাছাড়া এখনই কাউকে কিছু জানাতে ওরা কেন বারবার নিষেধ করছে ?'

সোমেন বলল,—'এর থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে লোকগুলোর সঙ্গে রতনের আগে কোথাও পরিচয় হয়েছিল।'

—'সেটা সম্ভবত নাগ পাহাড়ে।'—মিলন মন্তব্য করল।

—'তাহলে রতন নিশ্চয় নাগ পাহাড়ে গিয়েছিল।' মণীশ কথাটা যেন তাদের দিকে ছুঁড়ে দিল। ফের মিলনকে প্রশ্ন করল, 'ক্লাসে ও তোদের নাগ-পাহাড়ের গল্প-টল্প বলেনি ?'

—'না। ডিসেম্বরের প্রথমেই তো জয়পুরে গেল। এক কাকার সঙ্গে। সেখানে ওর পিসি থাকে। ফিরে এসে ক'দিন খুব রাজস্থানের গল্প-টল্প বলছিল।'

—'হুঁ'—মণীশ কী যেন চিন্তা করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল,—'শোন, সমস্ত প্ল্যানটা আমি ছকে নিয়েছি। কাল ভোরে আমরা দুর্গাপুর হয়ে কলকাতা যাব। সেখানে আমার এক মাসতুতো ভাই রতীশদা থাকে। উনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কেসটা রতীশদাকে ভালো করে বুঝিয়ে তার মতামত জিজ্ঞাসা করব। তারপর ওকে সুদ্ধ আমাদের দলে টানতে পারলে রতনকে উদ্ধার করা নিশ্চয় কঠিন হবে না।'

সোমেন বলল,—'কিন্তু প্রাইভেট ডিটেকটিভরা তো এ সব কেসে আগাম ফিজ নিয়ে থাকে! সেটা আমরা কেমন করে দেব ?'

—'উঁহুঁ,' রতীশদা ঠিক সেরকম ডিটেকটিভ নয়। আসলে এটাকে সে

পেশা হিসেবে নেয়নি। প্রফেসন্যাল লোক হলে নিশ্চয় আগাম চাইত। তবে রতীশদা বড়লোকের ছেলে। কলকাতা শহরেই দুখানা বাড়ি। মেসোমশাই অনেক টাকা রেখে গিয়েছেন। তাই চাকরির ধান্দা না করে এই ক্রিমিনোলজি মানে অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে আছে।'

মিলন ঈষৎ সন্দেহের সুরে বলল,—'ইয়ে মানে তোমার রতীশদার বেশ নাম-টাম আছে তো?'

—'তা নাম হয়েছে বৈকি।' মণীশ সগর্বে জানাল। বলল,—'এই তো মাস ছয় আগে পার্ক স্ট্রিটের একটা দোকানের রোলিং সাটার ভেঙে চোর সোনাদানা, হীরে পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। পুলিস তো কোনো ক্লু খুঁজে পায়নি। শেষ পর্যন্ত রতীশদার সাহায্য নিয়ে চোরের সর্দারকে এয়ারপোর্ট হোটেলে বামাল গ্রেপ্তার করল।'

সোমেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'কাল ভোরে তো রওনা হতে বলছ। কিন্তু সঙ্গে কি নিতে হবে?'

—'শীতের জামাকাপড় তো অবশ্য দরকার। তার সঙ্গে আমাদের স্কাউটের ইউনিফর্ম। তবে, বেশী লাগেজ সঙ্গে নেওয়া বোকামি হবে।'

মিলন বলল,—'নাগ-পাহাড় নামটা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের হয়তো পাহাড়ে উঠতে হতে পারে।'

—'সেটা অসম্ভব নয়।' মণীশ জানাল।

সোমেন জিজ্ঞাসা করল,—'নাগ-পাহাড় কত উঁচু হবে? আমাদের শুশুনিয়া পাহাড়ের মতো?'

মণীশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রায় হতাশ ভঙ্গি করে বলল,—'নাগ-পাহাড় কোথায় তাই তো এখনও জানি না। তবে পাহাড়ে চড়ার জিনিসপত্র সঙ্গে থাকলে কাজে লেগে যেতে পারে।' ফের মিলনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'তোদের একটা স্লিপিং ব্যাগ আছে না?'

—'হ্যাঁ, দার্জ্জিলিং থেকে বড়দা কিনে এনেছিল।'

—'ওটা সঙ্গে নেব মণীশদা?' মিলন জিজ্ঞাসু হল।

—'নিলে ভালো হয়। ঠাণ্ডায় শ্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকে ঘুমোলে আরাম পাবি। তারপর একটা শক্ত রোপ প্রয়োজন। এ ছাড়া বড় ছুরি, আত্মরক্ষার জন্য হঠাৎ দরকার হতে পারে এমন কিছু জিনিস সঙ্গে থাকলে উপকার হবে।'

বেলা বারোটা নাগাদ দারোগাবাবু এল সাইকেলে চেপে। বলল, —'জীপটা দুদিন হল খারাপ, সারাতে গেছে। এই সাইকেল ঠেঙিয়ে আর কত ডিউটি করা যায় ?'

মণীশ একা ছিল। সোমেন আর মিলন বাড়িতে। কলকাতা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করল,—'ছেলেটার কোন হদিশ পাওয়া গেল ?'

—'আজ্ঞে না'—মনীশ সবিনয়ে জানাল। ফের মাথা চুলকে বলল,—'একটা কথা শুনবেন ?'

—'কি ?'

—'খবর পেলাম ভৈরবস্থানের কাছে তিনজন অচেনা লোক ক'দিন ধরে ঘোরাফেরা করছিল।'

—'কার কাছে শুনলে ?' দারোগাবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল।

—'আজ্ঞে এই পাড়ার একজন রিকশাওয়ালার কাছে, সেই বলছিল।' মণীশ নিপুণ অভিনেতার মত ডায়েরীর কথা বেমালুম চেপে গেল।

—'হুম্'। দারোগাবাবু ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবল।

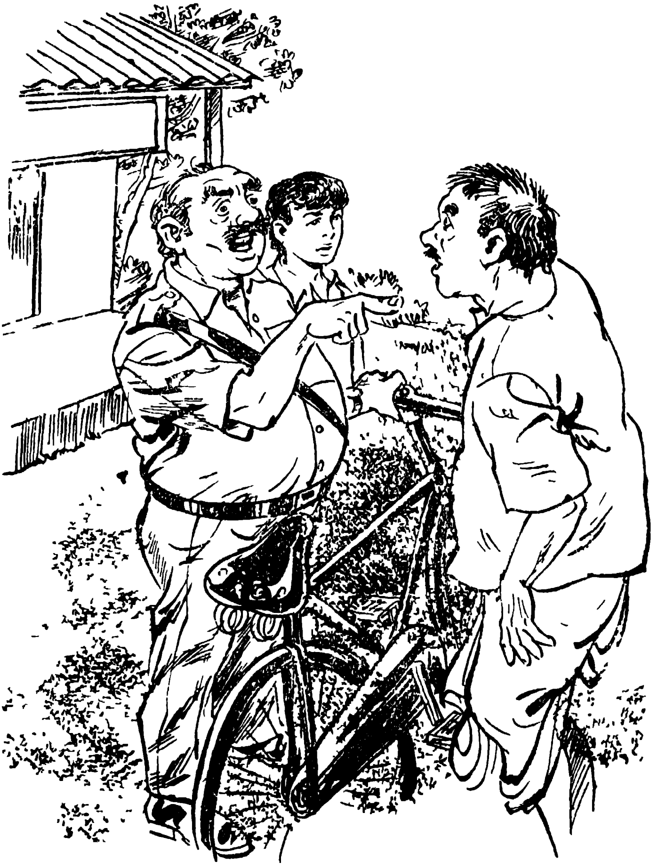
মণীশ বলল,—'ওই লোকগুলোর সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিলে হয় না ?'

—'অবশ্য। চল না আমার সঙ্গে, এখুনি একটা চক্কর দিয়ে আসা যাক।'

মণীশ তাই চাইছিল। দারোগা সঙ্গে থাকলে এ সব তদন্তে একটা বাড়তি সুবিধে। সে যদি নিজে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে যায়, লোকে পাত্তাই দেবে না। কিন্তু দারোগার রক্তচক্ষুর সামনে ওজর-আপত্তি টিকবে না। হলও তাই। ভৈরবস্থানের পাশেই একটা

মুদির দোকান। দারোগার ডাক শুনেই দোকানি আসন ছেড়ে তড়িঘড়ি নিচে নেমে এল।

প্রায় হুংকার ছেড়ে দারোগাবাবু প্রশ্ন করল—'এদিকে কোনো নতুন লোক এসেছে বলে জানো?'



'এদিকে কোনো নতুন লোক এসেছে বলে জানো?'

—'নতুন লোক?' দোকানি প্রথমে থতমত করল। মনে হল কথাটার অর্থ যেন সে ধরতে পারেনি।

মণীশ বলল,—'নতুন লোক মানে বাইরের লোক। আগে কোনোদিন যাদের দেখনি।'

দোকানি ঘাড় চুলকে কি যেন চিন্তা করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল,—'তিনটে অজানা-অচেনা লোক একটা গাড়ি করে এসে ওই দিকে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। অন্ততঃ দুবার আমার দোকান থেকে সওদা নিয়ে গেছে।'

মণীশ জিজ্ঞাসা করল,—'লোকগুলো কোথা থেকে এসেছে, কিছু বলেছিল?'

—'আজ্ঞে না'—আকর্ণ হাসল মুদি।

—'দেখতে কি রকম? কথা বলছিল কোন্ ভাষায়?'

—'বেশ ষণ্ডা গোছের চেহারা। একজনের জুলপি দেখবার মতো। গায়ের রঙটা রোদে পোড়া, তামাটে। বাঁ দিকের কানটা অর্ধেক নেই।'

—'কানকাটা?'—দারোগাবাবু চোখ কপালে তুলে ফেলেন আর কি!

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। হিন্দুস্থানী লোক।'

—'এখান থেকে গেল কবে?'

—'তা তো বলতে পারবনি। কাল বিকেলে একবার যেতে দেখেছিলাম। ত্যাখন সাড়ে চারটের মত হবে।'

দারোগাকে লক্ষ্য করে মণীশ বলল,—'আর কি খোঁজ নেবেন? পাখি তো উড়ে গেছে।'

দারোগাবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললে,—'শুনলে তো, গাড়ি ছিল সঙ্গে। আগে জানতে পারলে ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে দিতাম। চেক-পোস্টে সেরকম গাড়ি দেখলে আটক করত।'

—'গাড়ি থাকলে ও এখন বহুদূরে চলে গেছে। আট-দশ ঘণ্টায় তিন'শ-সাড়ে তিন'শ মাইল।' বললে মণীশ।

সাইকেল নিয়ে এগোল দারোগাবাবু। বলল,—'এখানে আর কিছু করবার নেই। কেসটা কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন চাই ছেলেটার দু-কপি ছবি। রেডিও টি. ভি. এমন কি খবরের কাগজেও ছবি ছাপলে ভাল হয়।'

মণীশ কোন মন্তব্য করল না। সে ভাবছিল রতন এখন কোথায়, কত দূরে? কেন কিডন্যাপ্ করা হল বেচারাকে? পড়ার ঘরেই বা হানা দেওয়া হল কেন?

তবে কি সত্যি রতনের কাছে গুপ্তধনের নকশা আছে?

গুপ্তধনের নকশা! না, অন্য কিছু?

॥ পাঁচ ॥

রতীশ খাসনবিশের অফিসটা দোতলায়। অফিস মানে তার ফ্ল্যাটের একটা অংশ। দুখানা পাশাপাশি ঘর। সামনেরটা অপেক্ষাকৃত ছোট, পরেরটা বেশ বড়।

হাওড়া স্টেশনে নেমে মণীশ সোজা বাস ধরে উড্ স্ট্রিটে তার এই মাসতুতো দাদার ঠিকানায় এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে মিলন আর সোমেন। ওদের দুজনের পিঠে ভ্রমণকারীর হ্যাভারস্যাক। তাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে। মণীশের হাতে শুধু একটা ঝোলান ব্যাগ। সেটা বেশ বড় মাপের, অনেক জিনিসপত্র ধরে।

খাসনবিশ একটা বিলিতি জার্নালের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন নিবিষ্টমনে দেখছিল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল,—'মণীশ, তুই? এরা কারা?'

হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে মণীশ বলল,—'সেই ভোর পাঁচটায় রওনা দিয়েছি। দুর্গাপুরে কোলফিল্ড ধরে হাওড়ায় পৌঁছতে বেলা পৌনে এগারোটা বাজল। তারপর বাসে প্রায় স্যাণ্ডুইচ হয়ে তোমার দরজায় এসে দাঁড়াবার আগেই শরীরের সব শক্তি গেছে। এখন একটু বসে জিরিয়ে নিতে দাও।'

—'হ্যাঁ, বস। পাখাটা খুলে দেব? বল, যদি গরম লাগে—'

—'দাও, একটু কম পয়েণ্টে চালিয়ে। কলকাতায় তো একদম শীত নেই দেখছি।'

পাখাটা চালিয়ে দিয়ে রতীশ অন্য দুজনকেও বসতে বলল।

মিনিট দুই-তিন পরেই মণীশ সোজা হয়ে বসল। পাল্টা শুধোল,—'আচ্ছা, বল দিকি আমরা কেন এসেছি? তুমি তো প্রাইভেট ডিটেকটিভ, আন্দাজ কর।'

—'কেন আবার?' রতীশ মুচকি হেসে বলল,—'তোর মাথায় নিশ্চয় পোকা ঢুকেছে, তাই।'

—'পোকা ?'

—'হ্যাঁরে, কেসের পোকা।'

—'বেশ। তাহলে কি কেস সেটা বল।' মণীশ প্রায় পরীক্ষকের মতো ভ্রূ কোঁচকাল।

খাসনবিশ ঈষৎ চিন্তা করে বলল,—'তোর পাড়ার কোনো ছেলে, বিশেষ বন্ধু অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ হারিয়ে গেছে কিংবা বিপদে পড়েছে বলে মনে হয়। তাকে উদ্ধার করবার জন্যে পরামর্শ নিতে আমার কাছে এসেছিস। আরো বুঝতে পারছি তোদের গন্তব্যস্থল নিশ্চয় কোনো পাহাড়-টাহাড় হবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে মণীশ মাসতুতো দাদার পায়ের ধুলো নিল। বলল,—'সত্যি রতীশদা, এখন মনে হচ্ছে রতনকে তুমি উদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু আগে বল তো, আন্দাজটা করলে কি করে ?'

রতীশ আদৌ না ভেবে বলল,—'খুবই সহজে। হাওড়া স্টেশন থেকে তিন মূর্তি যখন সোজা আমার কাছে এলি, তখন মনে হল প্রয়োজনটা এখানেই। নিশ্চয় কোনো পরামর্শ চাস। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম চিন্তা-ভাবনায় আধমরা অবস্থা প্রত্যেকেরই। নিশ্চয় তোদের তিনজনের খুব কাছের মানুষ, যেমন পাড়ার ছেলে, অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ হারিয়ে গেছে অথবা খুব বিপদে পড়েছে। নইলে এরকম মুখের চেহারা হয় না কারুরই। তারপর পিঠে হ্যাভারস্যাক, কত জিনিসপত্র। ভেতর থেকে একটা শক্ত দড়ি, স্লিপিং ব্যাগ উঁকি দিচ্ছে। শেষে ওই ছেলেটির হাতে পাহাড়ে চড়ার লাঠিটা দেখে আর সন্দেহ রইল না যে তোরা কোনো পাহাড়-টাহাড়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিস। তবে তোর কথা শুনে বুঝতে পারছি কেসটা কিডন্যাপিংয়ের। নাম তার রতন।'

—'চমৎকার।'—মণীশ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'বয়স তার তের। ক্লাস এইটে পড়ে। ওই মিলনের সঙ্গে একই সেকশনে। পরশু বিকেল-বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে নিখোঁজ। তবে অভিরাম চানাচুর-ওয়ালা ওকে সন্ধ্যেবেলা ভৈরবস্থানের দিকে যেতে দেখেছিল।'

খাসনবিশ টেবিলে একটা টোকা মেরে বলল,—'এই নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ওর বাড়ির লোকে পুলিসে জানিয়েছে ?'

—'হ্যাঁ। এই তো জেনারেল ডায়েরীর নম্বরটা। আমি লিখে এনেছি।'

—'কই দেখি।'

—'রতন যেদিন নিখোঁজ হল, সেদিন রাত্তিরেই আবার ওদের বাড়িতে একটা চুরিও হয়।'

—'চুরি ?'

—'হ্যাঁ। তবে চোরে দামী জিনিসপত্র নেয়নি। শুধু রতনের পড়ার ঘরে কি যেন খোঁজাখুঁজি করেছে। ওর বোন স্মৃতি বলছিল তার দাদার অ্যালজেব্রা, বিজ্ঞান আর ভূগোল বইখানার হদিশ পাচ্ছে না। অনেক খাতাপত্রও নাকি টেবিলে নেই।'

খাসনবিশ প্রশ্ন করল,—'রতনের পড়ার ঘরটা ভালো করে দেখা হয়েছিল ? ওর লেখা কোন চিঠি কিংবা কাগজপত্র পাওয়া যায়নি ?'

মণীশ চাপা গলায় বলল,—'চিঠিপত্র মানে একটা ছোট ডায়েরী আমি পেয়েছি। কিন্তু সে কথা আর কেউ জানে না।'

—'ডায়েরী বই থেকে কোন ক্লু পেলি ?'

—'হ্যাঁ। দু-এক পাতা পড়ে মনে হয় রতনের কাছে এমন একটা কিছু ছিল যার জন্য নাগ-পাহাড় থেকে অন্ততঃ তিনজন লোক বাঁকুড়াতে এসেছে।'

—'সেটা কী ?'

পেছন থেকে সোমেন জবাব দিল,—'গুপ্তধনের নকশা বলেই তো মনে হয়। অথবা ওই জাতীয় কিছু।'

রতীশ এক মুহূর্ত চিন্তা করল। হাত বাড়িয়ে বলল,—'ডায়েরী বইটা দেখি।' মণীশ তাড়াতাড়ি সেটি এগিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে ডায়েরীর প্রত্যেকটি পাতা উল্টে গেল রতীশ। কোথাও মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড, কোথাও বা ঝাড়া এক মিনিট কিংবা

আরো বেশীক্ষণ চোখ বুলোল। একটা পেন্সিল বের করে দু-তিন জায়গায় দাগ টানল। অনেকক্ষণ পরে স্বগতোক্তির সুরে বলল,—নাগ পাহাড় ?

বলেই ডায়েরী বইটা হাতে নিয়ে রতীশ পাশের ঘরে ঢুকল। ঘরের দুটি দেওয়ালে কাচ বসান আলমারি। তাতে নানা বিষয়ের ঠাসা বই। ইতিহাস, অপরাধ বিজ্ঞান, পুলিস জার্নাল, এ ছাড়া আইনের মোটা মোটা গ্রন্থ, ভূগোলের বইও রয়েছে।

মণীশ এল পেছন পেছন।

একটা মোটা বই টেনে নিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টে গেল রতীশ। কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে হঠাৎ সহর্ষে ঘোষণা করল,—'পেয়েছি, চল।'

মণীশ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রতীশ বলল,—'নাগ পাহাড় হল রাজস্থানে। আজমীরের কাছে, এই ধর আট-দশ মাইল দূরে। পাহাড়টা বেশী উঁচু নয়, হাজার দুই ফুট হবে।

মিলন বলল,—'তাহলে তো ঠিক মিলে যাচ্ছে। রতন ডিসেম্বর মাসে রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছিল।'

রতীশ বইটা বন্ধ করে সোমেনকে প্রশ্ন করল,—তোমার ধারণা রতনের কাছে একটা গুপ্তধনের নকশা বা ওই জাতীয় দামী কিছু ছিল, তাই তো ?'

—'নইলে লোকগুলো নাগ পাহাড় থেকে বাঁকুড়াতে আসতে যাবে কেন ?'

রতীশ বলল,—'ঠিক কথা। রতনের কাছে এমন কিছু একটা ছিল, যার মূল্য অনেক—কয়েক লক্ষ টাকাও হতে পারে।'

—'কয়েক লক্ষ টাকা? বলেন কি রতীশদা ?'—মিলনের চোখ দুটি প্রায় গোলাকার হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পরে যেন দুঃখ করে বলল, —'রতনটা ভীষণ চাপা। ওর পেটটা ব্যাঙ্কের লকার। আশ্চর্য ছেলে বাবা। কারো কাছে কোনোদিন এ সব গল্প করেনি।'

রতীশ বলল,—'কাউকে যখন বলেনি, তখন জিনিসটা সে সহজে হাতছাড়া করবে, তা বিশ্বাস হয় না।'

—'রতন কি এখন সেই নাগ পাহাড়ে?'—মণীশ প্রশ্ন করল।

রতীশ প্রশ্নের জবাব দিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে শুধু বলল, —'আজই আমাদের নাগ-পাহাড় রওনা হতে হবে, বুঝলে?'

—'আজই?'

—'হ্যাঁ। অবশ্য এর জন্য অনেক খরচপত্র আছে। খরচ-খরচার টাকা নিশ্চয় উঠে আসবে দামী জিনিসটা সমেত রতনকে উদ্ধার করতে পারলে।'

—'খরচপত্রের জন্য আগাম কিছু দিতে হবে না ভেবেই তোমার কাছে এসেছি রতীশদা।'—বললে মণীশ।—'তা ছাড়া রতনের বাবা একটা ছোটোখাটো চাকরি করেন। ছেলের হাতে যে অমন একটা দামী জিনিস আছে, তা উনি এখনও জানেন না।'

রতীশ ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ পায়চারি করছিল। তার চোখ মুখ দেখে মনে হল কী এক গভীর চিন্তায় সে ডুবে যাচ্ছে। খরচপত্রের ব্যাপারে কী হবে তাই নিয়ে মণীশের সঙ্গে আলোচনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ সে দেখাল না। বেশ কিছুক্ষণ আত্মচিন্তায় মগ্ন থেকে হঠাৎ বলে উঠল,—'আজকের রিজার্ভেশন পাওয়া কঠিন। তবু একবার ট্রাই করি। যদি ভি. আই. পি. কোটা থেকে চারখানা টিকিট পাই।' —বলেই রতীশ টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল।

অপর প্রান্তে কে যেন লাইন ধরল।

রতীশ বলল,—'আমি মিঃ খাসনবিশ বলছি। হ্যাঁ, আমার চারখানা বার্থ চাই। আজই দিল্লী রওনা হব। খুবই জরুরী। হ্যাঁ, একটা ইন্টারেস্টিং কেস হাতে। বিলম্বে বিঘ্ন ঘটতে পারে। বেশ, তাহলে আমাকে মিনিট দশ পরেই জানাবেন। ও. কে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রতীশ বলল,—'তোরা বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে আয়। আগে চা-টা খেয়ে নে। তারপর স্নান-

টান করবি। কালীনাথকে বলছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভাত-তরকারি বানিয়ে দেবে।'

মিনিট দশ পার হবার আগেই টেলিফোন ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল। রতীশ হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল। টেলিফোনের শব্দ শুনেই মণীশ তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। মাসতুতো দাদা কি কথাবার্তা বলে শোনার জন্য সে উদগ্রীব চোখে তাকিয়ে।

রতীশ রিসিভারটা তুলেই তার নাম জানাল। লাইনে দু-চার সেকেণ্ড কান রেখে সে খুশিতে বলে উঠল,—'রাজধানীতে রিজার্ভেশান পাওয়া গেছে? ভেরি গুড। এ. সি. শ্লিপার না হলেও অসুবিধে নেই। একটা রাত্তির চেয়ার কারে দিব্যি চলে যাব। তাড়াতাড়ি যাওয়া নিয়ে কথা, বুঝলেন? আশাকরি কাল রাত্তির নাগাদ আজমীরে পৌঁছে যাব।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রতীশ প্রায় সৈন্যাধ্যক্ষের মতো আদেশ দিল,—'রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়ে চারটে পঞ্চাশ মিনিটে। কাল সকাল দশটা নাগাদ দিল্লী। সেখান থেকে গাড়ি কিংবা বাসে আজমীরে পৌঁছুতে রাত্তির আটটা-ন'টা হবে। নাও বি কুইক। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু রেস্ট নাও। দেন গেট রেডি। বেলা তিনটে নাগাদ শুরু হবে আমাদের যাত্রা--অপারেশন নাগ-পাহাড়, ফার্স্ট ফেজ।'

প্রায় সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মিলন, সোমেন দুজনেই হ্যাভার-স্যাকে জিনিসপত্র গুছিয়ে এনেছে। তবু মণীশ জিজ্ঞাসা করল,—'রতীশদা, একবার এই লিস্টটায় চোখ বুলিয়ে নেবে, যদি আর কিছু সঙ্গে নেবার প্রয়োজন থাকে।'

লিস্টের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে রতীশ ঘোষণা করল,—'মোটামুটি সব ঠিক আছে। আর যা নিতে বাকি রইল, সেগুলো আমার সঙ্গে যাবে।'

সোমেন বলল,—'আমরা তো সবই নিয়েছি রতীশদা। কিছু ভুল হল নাকি?'

রতীশ হেসে জবাব দিল,—'এই ধরনের অপারেশানে আরো দু-

একটা জিনিস দরকার হয়। যেমন ধর একটা পাওয়ারফুল বাইনোকুলার, একটা ছোট টেপ রেকর্ডার, কিছু ওষুধপত্র আর'—বলেই রতীশ যেন রহস্য করে ঈষৎ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল।

মিলন না বুঝতে পেরে বলল,—'থামলেন কেন? বাকিটা শেষ করুন।'

পকেট থেকে ছোট্ট একটি অটোমেটিক রিভলবার বের করে রতীশ



এটা তো আর তোমার সঙ্গে নিতে পারবে না। তাই বলেছি
বাকি জিনিস আমার সঙ্গে যাবে।

তুলে দেখাল। বলল,—'এটা তো আর তোমরা সঙ্গে নিতে পারবে না। তাই বলেছি বাকি জিনিস আমার সঙ্গে যাবে।'

মণীশ দাবি করল,—'আমাকে কিন্তু ওটা চালান শিখিয়ে দিতে হবে রতীশদা। এখনই না হোক—পরে।'

—'ধৈর্য ধর। সবুরে মেওয়া ফলে।'—রতীশ হাসল। ফের বলল,—'নাগ-পাহাড়ে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে হাতে কলমে শিক্ষা হয়ে যাবে।'

॥ ছয় ॥

নিউ দিল্লি স্টেশনে যখন সকলে গাড়ি থেকে নামল, তখন দশটা নয়, প্রায় এগারটা বাজে। রাজধানী এক্সপ্রেস দ্রুতগামী ট্রেন, তবু টুণ্ডলার কাছে গাড়ি প্রায় চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। তার আগে লাইনের গণ্ডগোল, কিংবা ওই ধরনের কোন বিপত্তির জন্য ধানবাদেও ট্রেন লেট করেছিল। অনেক চেষ্টা করেও ড্রাইভার ঐ বিলম্বটুকু মেক-আপ করে নিতে পারেনি।

রাজধানী এক্সপ্রেসে ওঠার অভিজ্ঞতা তিন বন্ধুর এই প্রথম। গাড়ি হাওড়া স্টেশন ছাড়তেই সাউণ্ড বক্সে বাংলা গান শুরু হল। কখনও রবীন্দ্র সংগীত, কখনও আধুনিক। বর্ধমান পেরোবার আগেই বেয়ারা এসে সামনের সীটের গায়ে লাগানো ছোট্ট স্ট্যাণ্ডটা খুলে ফিট্ করে দিল। তার ওপর ফ্লাস্ক-ভর্তি চা আর খাবার রেখে গেল। রাত্তির ন'টা বাজতেই ফের বিরিয়ানী আর চিকেন এল। শেষে আইসক্রিম দিয়ে নৈশাহার সমাপন। ইতিমধ্যে কখন বাংলা গানের বদলে হালকা হিন্দি গান শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে কামরার আলোগুলি প্রায় নিভু-নিভু হয়ে এলো। চেয়ারে বসে সমস্ত রাত্তির ঘুমিয়ে কাটানো বেশ কষ্টের। কিন্তু উপায় নেই। অবশ্য মাথা অব্দি গদি, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বগী। ইচ্ছে করলে চেয়ারটা একটু হেলিয়ে নেওয়া চলে। তবে শরীর ক্লান্ত, সেই ভোরবেলায় উঠে তিনজনে বেরিয়েছে। তাই গাড়ি দ্রুতগামী হতেই কখন যেন সকলের চোখে ঘুম জড়িয়ে এল।

ভোরবেলা সোমেন প্রথম জেগে উঠল। তার সীটটা জানালার ধারে। ঈষৎ ঘাড় হেলিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, ট্রেনটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। ফুরফুরে হাওয়া, ভোরের আলো ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। খানিকক্ষণ পরে গাড়ি একটা বড় স্টেশনের

কাছে এল। জোড়া জোড়া সমান্তরাল অনেক রেললাইন। এদিকে সেদিকে মালগাড়ির বহু খালি ডিব্বা, কয়েকটা ইঞ্জিন শান্টিং করছে। ট্রেনটা প্লাটফর্মে ঢুকবার মুখে সোমেন দেখতে পেল তারা কানপুরে এসে পৌঁছেচে।

রতীশ অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।

সোমেন তার গায়ে হাত রেখে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকল,—'রতীশদা, কানপুর তো এসে গেল। দিল্লি আর কতদূর?'

নিদ্রাজড়িত চোখে রতীশ একবার বাইরে তাকিয়ে ফের চোখ বুজে জবাব দিল,—'বেলা এগারোটার আগে দিল্লি পৌঁছাব বলে মনে হয় না।'

ঘুম ভেঙেছে মিলনেরও। সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল,—'প্ল্যাটফর্মে নেমে মুখ হাত ধুয়ে আসব?'

রতীশ চোখ খুলল না। চেয়ারে শায়িত অবস্থায় মৃদুস্বরে জানাল, —'গাড়ি মাত্র পাঁচ মিনিট দাঁড়ায়। তার আগে কামরায় উঠবি, নইলে—'

সোমেন হেসে উত্তর দিল,—'এখানেই পড়ে থাকতে হবে, এই তো?'

রতীশ আর বাক্যব্যয় না করে একটু নড়েচড়ে ফের হেলানো চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে রইল।

মিলন একা নয়, তার পিছু পিছু সোমেন আর মণীশও নেমে এলো। ইতিমধ্যে সকলেই জেগে উঠেছে। প্রত্যেকের হাতে পেস্ট লাগানো ব্রাশ, কাঁধে তোয়ালে। কাছে একটা জলের কল আর বেসিনের দিকে নজর পড়তেই তিনজনে সেদিকে দৌড়ে গেল। মাত্র পাঁচ মিনিট সময়। শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিন রাজধানী এক্সপ্রেসকে টানে। একবার যাত্রা শুরু করলে গাড়ি ঝটিতি স্পীড্ নেয়। চলন্ত ট্রেনে ওঠা রীতিমত রিস্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনে তাড়াতাড়ি দাঁতে ব্রাশ ঘষতে শুরু করল। চটপট মুখ ধুয়ে তোয়ালে বুলিয়ে জল মুছল। পাশেই

একটা লোক গরম সিঙাড়া ভাজছিল। সোমেন পকেট থেকে দু-টাকার নোট বের করে কাগজের ঠোঙায় আটটা সিঙাড়া নিল। মণীশ হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল,—'অ্যাই, চল-চল। ওই ছ্যাখ রতীশদা কম্পার্টমেণ্টের দরজায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

কামরায় উঠতেই রতীশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—'আর তিরিশ সেকেণ্ড হলেই গাড়ি ছেড়ে দিত। সাড়ে চার মিনিট কেটে গেল, তবু তোরা এলি না দেখে ডাকতে এলাম।'

সোমেন ঠাট্টা করে বলল,—'তুমি তাহলে ঘুমোওনি, মটকা মেরে পড়েছিলে?'

রতীশ মুখ গম্ভীর করে বলল,—'ঘুম কি অত সহজে আসে? এখন কত চিন্তা বল দিকি? কিডন্যাপ্ করে রতনকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল, তাই বুঝতে পারছি না। তারপর তোরা রইলি প্ল্যাটফর্মে পড়ে, আর আমি কি নাক ডাকিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি?'

—'সত্যি'। মণীশ সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে জানাল,—'তোমার এখন অনেক দায়িত্ব রতীশদা। রতনকে যে ভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে। নইলে মেসোমশায় মানে ওর বাবার কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব না।'

ইতিমধ্যে গাড়ি কখন চলতে শুরু করেছে। দু-পাশে দেহাতী গ্রাম, ক্ষেতে ফসল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে কপির চাষ, ক্যানাল দিয়ে জল যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের চাষীর অবস্থা ভালো,—ক্ষেতে গম আর আখ ছাড়াও নানা ধরনের রবিশস্য জন্মায়। সকালের হালকা রোদে একদল ছেলে বইপত্তর বগলে নিয়ে কলরব করে কোথায় পড়তে যাচ্ছে।

কখন সাউণ্ড বক্সে ঠুংরি আর গজল শুরু হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট বাদেই ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে গেল। গাড়ির বাথরুমে মুখ হাত ধুয়ে রতীশ এসে চা নিয়ে বসল। ট্রেন দ্রুতগতিতে ছুটছে। মাঝে মাঝে ঘোষকের মিষ্টি গলায় সংযোজন,—'আপনাদের রাজধানী

এক্সপ্রেস এখন কানপুর ছাড়িয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটে চলেছে। আমরা আশা করি ট্রেন নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ পরেই নিউ দিল্লি গিয়ে পোঁছবে।'

জানালার পাশে বসে সোমেন নিবিষ্ট মনে শুনছিল। রতনের কথা ভাবলেই মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে আসে, তবু সব মিলিয়ে এই সওয়া ন'শ মাইল পথ গাঢ় ঘুমে দেখা একটি সুখ-স্বপ্নের মত কি সুন্দর যেন অতিবাহিত হল।

॥ সাত ॥

স্টেশনে নেমে রতীশ বলল,—'আমাদের এখুনি বিকানীর হাউসে যেতে হবে। সেখান থেকেই আজমীরের বাস ছাড়ে। আগে বুকিং না করলে গাড়িতে সীট পাওয়া কঠিন।

মণীশ বলল,—'আজমীর যাবার ট্রেনও নিশ্চয় আছে?'

—'হ্যা, তা আছে।'—রতীশ জবাব দিল,—'তবে এখানে মিটার গেজের গাড়ি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন টিকিয়ে টিকিয়ে চলে। অবশ্য ভোরে পিংক সিটি এক্সপ্রেস ছাড়ে। আগে জয়পুর অব্দি যেত, এখন আজমীর ছাড়িয়ে উদয়পুর পযন্ত রান করে।'

—'ট্রেনটার নাম পিংক সিটি এক্সপ্রেস?'—সোমেন জিজ্ঞাসা করল।

—'হ্যাঁ। কারণ জয়পুর শহরকে গুলাবী শহর বা পিংক সিটি বলে। পুরানো জয়পুরের বাড়ি-ঘর, বাজার-হাট, সব কিছু পিংক বা গাঢ় গোলাপী রঙের। আগে গাড়িটা শুধু জয়পুর অব্দি যেত। তাই ট্রেনের নাম পিংক সিটি এক্সপ্রেস রাখা হয়েছিল।'

মিলন জিজ্ঞাসা করল,—'জয়পুর খুব পুরানো শহর, তাই না?'

রতীশ জবাব দিল,—'এখন যাকে জয়পুর বলা হয়, সেটা বেশী দিনের নয়। প্রায় দু'শ ছাপান্ন বছর আগে রাজা সোয়াই জয়সিংহ নগর নির্মাণের নির্দেশানুসারে এই শহরটির পরিকল্পনা করেন। জয়সিংহ ছিলেন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী, মধ্যযুগের গ্রহ-নক্ষত্র গবেষণার অবজারভেটরি যন্তর-মন্তর তাঁর সৃষ্টি। জয়পুর এবং দিল্লি দু' জায়গাতেই যন্তর-মন্তর আছে।'

স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে সকলে এক সর্দারজীর গাড়িতে উঠল। মুখে দাড়ি-গোঁফ, মাথায় পাগড়ি,—যাত্রী পেয়ে তাকে বেশ উৎফুল্ল

দেখাল। গন্তব্যস্থল বিকানীর হাউস শুনে সর্দারজী মিটার নামিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিতে দেরি করল না।

বরাত ভাল। বেলা বারটায় একটা ডিলাক্স বাস ছাড়বে। চারটে সীটও পাওয়া গেল তাতে। মণীশ কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে নিয়ে এল।

রতীশ বলল,—'বাস ছাড়তে আর মিনিট কুড়ি দেরি। চল, কাছাকাছি কোন স্টলে উদরপূর্তি করে আসি। আজমীরে পেঁছিতে অন্ততঃ রাত্তির আটটা বাজবে।'

বাস স্ট্যাণ্ডের দোকানে খাবার বলতে পুরি আর তরকারি। তার সঙ্গে কিছু মিষ্টান্নও আছে। কিন্তু ভাত-ডালের বালাই নেই। অগত্যা তাই। হাতে সময় কোথায় যে আশেপাশে খোঁজখবর করে একটা ভালো হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি খালি টেবিলের চারপাশে বসে সকলে যা পারল চটপট খেয়ে নিল।

ডিলাক্স বাস। সীটে বসলে মাথা পর্যন্ত নরম গদী। নিউ দিল্লি ছাড়িয়ে বাস হু-হু করে ছুটে চলল। দু'পাশে মাঠ, শীতের নরম রোদ্দুর ফসল কেটে নেওয়া জমির ওপর নতুন রঙের মত জ্বলজ্বল করছে। ঘণ্টা দুই পার হতেই প্রকৃতি যেন রুক্ষ, কিঞ্চিৎ অনুর্বর মনে হল। দু'পাশে বাবলা কাঁটার গাছ বেশী। পথের ধারে চার-পাঁচটা উট চরে বেড়াচ্ছে। আরো খানিক দূর যেতেই ফসলহীন ক্ষেতের মধ্যে এক পাল ময়ূর চোখে পড়ল। তাই দেখে সোমেন সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠল,—'ময়ূর, ময়ূর!'

রতীশ বলল,—'ময়ূর আমাদের জাতীয় পক্ষী, সেটা জান তো?'

সোমেন অথবা মিলন কেউ তা শোনেনি। শুধু মণীশ সেটা জানত, সম্ভবতঃ খবরের কাগজে একবার দেখেছিল।

রতীশ বলল,—'অনুমান করা হয় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় ময়ূর প্রথম এদেশে আসে। তাঁর সৈন্যসামন্তের কেউ পোষা ময়ূর সঙ্গে করে এনেছিল। পরে সেটা এখানেই ছেড়ে

দেয়, কিংবা উড়ে যায়। তবে স্থানীয় লোকেরা ওকে ময়ূর বলে না, মৌরা বলে ডাকে।'

গাড়ি জয়পুরে ঢোকার মুখে সূর্য অস্ত গেল। এদিকে অবশ্য সন্ধ্যে হয় একটু দেরিতে। কলকাতার চেয়ে জায়গাটা আরো পশ্চিমে বলে।

আজমীরে যখন গাড়ি ঢুকল, তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজে। চলমান মোটরযানের দুলুনিতে মিলন কখন ঘুমোতে শুরু করেছে। বাস স্ট্যাণ্ডে গাড়ি গিয়ে থামতেই, মণীশ তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল,—'ওঠ তাড়াতাড়ি। এই সামান্য জার্নি করেই যে একেবারে নেতিয়ে পড়লি!'

রতীশ হেসে বলল,—'জার্নিটা মোটেই সামান্য নয়। গতকাল ভোর পাঁচটায় বাঁকুড়া থেকে রওনা হয়েছে। তারপর রাত্তিরে চেয়ার-কারে নিশ্চয় আরামে ঘুম হয়নি।'

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে চারজনে ট্যুরিস্ট লজে উঠল। রিজার্ভেশান ছিল না। কিন্তু এখন প্রায় অফ সীজন, ভিড় কম। তাই ট্যুরিস্ট লজে জায়গা পেতে অসুবিধে হয়নি।

একটা বড় কামরায় চারটে বেড। জিনিসপত্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে রতীশ একটা বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

মণীশ বলল,—'এ কি রতীশদা! প্রথমে তুমিই ভেঙ্গে পড়লে?'

—'নো ওয়ে ব্রাদার।'—রতীশ বিলিতী ঢঙে হাত তুলে নাড়ল। বলল,—'কাল ট্রেনে ভাল ঘুম হয়নি। তারপর টানা আট-ন' ঘণ্টার বাস-জার্নি। এখন খাওয়া সেরেই টেনে একটি ঘুম। তারপর কাল সকালেই শুরু হবে—অপারেশান নাগ-পাহাড়, ফেজ টু।'

ঘর থেকে বেরিয়ে মিলন বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। জায়গাটা ভারি নির্জন আর শান্ত। এই সন্ধ্যে রাত্তিরেই প্রশস্ত রাজপথে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। ট্যুরিস্ট লজের গেট ছাড়িয়ে ভিতরে ঢুকলেই

অনেকখানি জায়গা জুড়ে নুড়ি পাথর বিছানো। গেটের সামনে একটা টাঙা দাঁড়িয়ে। মিলন কাছে যেতেই টাঙাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল,—'আপ ট্যুরিস্ট হ্যয় ?'

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে মিলন এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'কাঁহা সে আ রহে ? পশ্চিম বংগাল ?' লোকটি ফের জিজ্ঞাসা করল।

মিলন এবার স্পষ্ট জবাব দিল,—'হ্যাঁ। পশ্চিম বাংলা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল। তবে আসছি সেখানকার বাঁকুড়া শহর থেকে।'

লোকটি ভ্রূ কুঁচকে শুধোল—'কাল পুষ্করজী দেখনে যায়েঙ্গে ?'

মিলন কিছু না ভেবেই উত্তর দিল,—'পুষ্করজী নয়, নাগ-পাহাড়। কাল সকালেই নাগ-পাহাড়ে যাব।'

টাঙাওয়ালাটা কেমন অদ্ভুত চোখে কয়েক সেকেণ্ড তাকে নিরীক্ষণ করল। তারপর আর দাঁড়াল না। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে দ্রুতগতিতে গাড়ি হাঁকিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

মিলন ঘরে এসে বলল,—'রতীশদা, একটা টাঙাওয়ালা জিজ্ঞাসা করছিল আমরা কোথা থেকে এসেছি।'

মণীশ ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে শুধোল,—'তুই কি বললি ?'

মিলন মুখ নিচু করে জবাব দিল,—'বলেছি আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে বাঁকুড়া থেকে আসছি।'

রতীশ শুনে বলল,—'আর কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল ?'

—'হ্যাঁ।' মিলন প্রায় ঘাড় নিচু করে জবাব দিল। বলল,—'ও জানতে চাইল আমরা কাল পুষ্করজী দেখতে যাব কিনা। তা আমি বললাম পুষ্করজী নয়, আমরা নাগ-পাহাড়,—কাল সকালে নাগ-পাহাড়ে যাব।'

—'ইডিয়ট্।' মণীশ মাথার চুলে হাত রেখে রীতিমত উষ্মা প্রকাশ করে বলল,—'সব ফাঁস করে দিয়ে বসে আছিস। এরপর ওরা সাবধান হবে। রতনকে আর উদ্ধার করা যাবে ভেবেছিস ?'

রতীশ কিন্তু রাগ করেনি। বরং মিলনকে উৎসাহিত করল। বলল,—'টাঙাওয়ালার সঙ্গে সেই লোকগুলোর কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। ট্যুরিস্ট ধরতে হোটেলের সামনে ওরা অমন দাঁড়িয়ে থাকে। মিলনকে দেখেই ওর বাঙালী বলে মনে হয়েছে। আর বাঙালী আজমীরে এলে পুষ্করে পুজো দিতে অবশ্য যাবে। তাই মিলন নাগ-পাহাড়ে যাবে শুনে লোকটা আর ভরসা রাখতে পারে নি। ছাখ গিয়ে নতুন ট্যুরিস্টের খোঁজে অন্য কোনো হোটেলের সামনে টাঙা রেখে এখন অপেক্ষা করছে।'

॥ আট ॥

ট্যুরিস্ট লজের নাম খাদিম, যার অর্থ অতিথি। রাত্তিরে ডাইনিং রুমে বসে চিকেন কারি আর রাইস খেতে সকলের বেশ ভাল লাগল। ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ার আগে রতীশ হঠাৎ তিনজনকেই কাছে ডাকল। বলল,—'ছ'টা সংখ্যার মধ্যে একটা জটিল ধাঁধা লুকিয়ে আছে, বুঝলি ? তোরা তিনজনে ট্রাই করে ছাখ তো, যদি এর কোন উত্তর বের করতে পারিস।'

—'ছ'টা সংখ্যা আপনি কোথায় পেলেন ? আর তার সঙ্গে ধাঁধারই বা সম্পর্ক কি ?'—সোমেন জিজ্ঞাসা করল।

—'এই ছ'টা সংখ্যা রতনের ডায়েরীতে লেখা আছে। সম্ভবতঃ মণীশের ওটা চোখে পড়েনি।'

—'কই দেখি একবার ডায়েরীটা'—সংখ্যাগুলি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে শুনেই মণীশ রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রতীশ তার পকেট থেকে ডায়েরীটা বের করে খুলে দেখাল। তার কথাই ঠিক। ডায়েরীর শেষদিকের একটা পাতার কোণে পরিষ্কার অক্ষরে ছ'টি সংখ্যা লেখা—৯, ৬, ৩, ৩, ৬, ৯,। তার খানিকটা নিচে ফের লিখেছে ২০, জানুয়ারী—

মারি তো গণ্ডার
লুটি তো ভাণ্ডার।

মিলন বলল,—'ওই সংখ্যাগুলি আসলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন। আর ভাণ্ডার মানেই তো গুপ্তধন। সেই ভাণ্ডার লুটে নেবার কথা ভেবেছে রতন। তবে ২০, জানুয়ারী কথাটা কেন লিখেছে তা কিছুতেই আমার মগজে আসছে না।'

সোমেন বলল,—'সাঙ্কেতিক চিহ্ন বললেই তো হবে না। তার অর্থ কি বুঝিয়ে দিতে হবে।'

রতীশ মন্তব্য করল,—'ব্যাপারটা নিশ্চয় ভেবে দেখার মতো। রতন হঠাৎ কেন এই সংখ্যাগুলো ডায়েরীর পাতায় লিখে রাখতে গেল, তার অবশ্য একটা কারণ থাকবে। তা ছাড়া ২০ জানুয়ারী তারিখটা টুকে রাখার অর্থ কী?'

মণীশ বলল,—'তাহলে এই নাগ-পাহাড়েই কোথাও লুকোন গুপ্তধন রয়েছে রতীশদা। আর যে কোন উপায়েই হোক, সেই গোপন স্থানে পৌঁছবার নকশাটা রতনের হস্তগত হয়। ওই লোকগুলো পরে তা জানতে পেরে বাঁকুড়ায় গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রতনকে ওরা কিডন্যাপ্ করে নিয়ে আসে। আর ওই গুপ্তধনের নকশাটার জন্যই ফের সেই রাত্তিরে রতনের পড়ার ঘরে ওরা হানা দিয়েছিল।'

সোমেন বলল,—'রতীশদা, এই ধাঁধাটা নিয়ে একটা কবিতা শুনবে?'

—'কবিতা?'

—'হ্যাঁ, এইমাত্র বানালাম।' বলেই সোমেন আবৃত্তি শুরু করল,—

নয় দিয়ে শুরু তার, নয় দিয়ে শেষ
দুই পাশে দুই ছয়, দেখে লাগে বেশ।
মাঝখানে জোড়া তিন, আর নেই ঠাঁই
ধাঁধাটার উত্তর দিতে পার ভাই?'

—'বিউটিফুল,'—রতীশ এগিয়ে এসে তার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিল। বলল,—'আগে এর উত্তরটা বের করি। তারপর তোকে আমি একটা প্রাইজ দেব, বুঝলি?'

মণীশ বলল,—'তাহলে রতীশদা, কাল সকালেই আমরা নাগ-পাহাড় যাচ্ছি?'

—'ইয়েস।' রতীশ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে বলল,—'একটা কথা সবাই মনে রেখ। এখন আমরা এনিমি ল্যাণ্ড অর্থাৎ শত্রুপুরীতে পা দিতে চলেছি। সুতরাং উই মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল। ধরে নাও আমাদের আজমীরে

আসার কথা ইতিমধ্যে শত্রুর কানে পৌঁছে গেছে। ফলে তারা যথেষ্ট সাবধান হবে এবং ঠিক সময়ে উপযুক্ত আঘাত হানবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। তবু আমার ধারণা শত্রুপক্ষ এখনও সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ নয়। কারণ হঠাৎ আমাদের চারজনকে দেখলে ট্যুরিস্ট ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা একটু বেমানান। আর তাই কাল নাগ-পাহাড়ে রওনা হবার আগে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিলে সুবিধে। সে কথা এখন তোমাদের বলছি।'

সোমেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'রতীশদা, নাগ-পাহাড়ে ওরা রতনকে লুকিয়ে রেখেছে ?'

রতীশ ভ্রূ কুঞ্চিত করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল,—'এটা আমার অনুমান। রতনকে এখনও ওরা নাগ-পাহাড়েই বন্দী করে রেখেছে। তার কাছে যে মূল্যবান জিনিসটা রয়েছে সেটা সম্ভবতঃ এখনও ওদের হস্তগত হয়নি।'

মিলন বলল,—'ওটা গুপ্তধনের নকশা, তাই না রতীশদা ?'

—'তা বলতে পারব না। তবে একথা ঠিক যে রতনের নিখোঁজ হওয়ার মূলে গুপ্তধনের নকশা কিংবা অমনি মুল্যবান কোনো বস্তু রয়েছে।' রতীশ জবাব দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেই বলল,— 'তবে আমার ধারণা ওটা গুপ্তধনের নকশা নয়।'

—'তাহলে কি ওটা ?' মণীশ সাগ্রহে শুধোল।

—'সেটা জানতে পারলেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যায়।' রতীশ মৃদু হেসে জবাব দিল।

মণীশ বলল,—'এখন আমাদের কি করণীয় সেটা জানিয়ে দাও।'

রতীশ বলল,—'কাল সকালে তোমরা ঠিক স্টুডেণ্টের মতো সাজ-পোশাক করে এখান থেকে বেরোবে।'

—'স্টুডেণ্টের মতো ? কেন রতীশদা ?' সোমেন শুধোল।

—'তার কারণ শত্রুর চোখে ধুলো দিতে আমাদের এমনি একটা কিছু কৌশল নিতে হবে। মনে কর তোমরা কোনো স্কুল থেকে একজন টিচারের কেয়ারে একস্‌কারশনে এসেছ। এখানকার পাহাড়

অঞ্চলের মাটি, গাছপালার সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে। সকালে তোমরা প্যাণ্ট, সার্ট আর সোয়েটার পরে বেরোবে। সঙ্গে আরো যা প্রয়োজনীয় তা অবশ্য নিতে ভুলবে না। হাতে একটা একসার-সাইজ বুক আর পেন্সিল থাকলে ভালো হয়।'

মণীশ বলল,—'কাল সকালে খাতা আর পেন্সিল কোনো দোকান থেকে কিনে নিলেই হবে।'

মিলন হেসে বলল,—'রতীশদা, তুমি তাহলে আমাদের মাস্টারমশায়?'

রতীশ কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিল,—'হ্যাঁ।'

এই ঘরটা একতলায়, সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম নেই। সোমেন করিডোরে কমন বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরে এসেই বড় বড় চোখ করে বলল,—'রতীশদা, লাউঞ্জের কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোক কটমট করে আমার দিকে তাকিয়েছিল।'

মণীশ জিজ্ঞাসা করল,—'লোকটা কেমন দেখতে? মানে আপত্তিকর কিছু মনে হল?'

—'তা জানি না,'—সোমেন বলল,—'তবে ইয়া ষণ্ডামার্কা চেহারা। গায়ে একটা ফুলহাতা উলের সোয়েটার। দিব্যি জুলপির বাহার।'—কি মনে হতে সোমেন ফের চেঁচিয়ে বলল,—'হ্যাঁ, লোকটার বাঁ দিকের অর্ধেক কান নেই।'

—'কী বললি? লোকটা কানকাটা?'—মণীশ রীতিমত গম্ভীর হয়ে গেল।

রতীশ বলল,—'ব্যাপার কী? লোকটাকে তুমি চিনতে পেরেছ মনে হচ্ছে।'

মণীশ দ্রুত বলে গেল,—'এই লোকটা এবং আরো দুজন বাঁকুড়াতে গিয়েছিল। ভৈরবস্থানের কাছে এক বাড়িতে আস্তানা পাতে। কাছেই একটা মুদির দোকান থেকে ওরা জিনিসপত্র কিনেছে। সেই মুদি বলেছে ওদের মধ্যে একজনের বেশ জুলপির বাহার, তার আবার বাঁদিকের কানটার অর্ধেক নেই।'

সোমেন ভয় পেয়ে বলল,—'এই লোকটাই তো সেই লোকটা। নিশ্চয় আমাদের মতলব বুঝতে পেরেছে।'

— 'না। ও কেবল আমাদের সন্দেহ করছে।'—রতীশ দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল। বলল,—'কাল সকালে আমাদের প্ল্যান মাফিক নাগ-পাহাড় অপারেশন শুরু হবে। এখন তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার।'

সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রায় একটা দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল।



দরজার ফাঁকে কেউ সেটা গলিয়ে দিয়ে গেছে

বিছানা থেকে নেমে সোমেন প্রথম জিনিসটা দেখতে পেল। দরজার ফাঁকে কেউ সেটা গলিয়ে দিয়ে গেছে। একটা সাদা খাম। উপরে

নাম-ঠিকানা নেই। খামটা ছিঁড়ে চিঠির ওপর ঝুঁকে পড়তেই সোমেনের চোখ দুটো প্রায় কপালে উঠল। লাল পেন্সিলে চিঠিখানা কেউ লিখেছে। কোণে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি আঁকা। তার মুখ থেকে যেন টপ টপ করে খুন ঝরছে। হিন্দিতে কয়েকটা লাইন। সোমেন প্রায় চিৎকার করে উঠল,—'রতীশদা, রতীশদা। এই দেখুন কি চিঠি।'

ঘুম ভাঙা চোখে রতীশ কোনোমতে লেখাটা পড়ল,—

বংগালী লেড়কা,
সব কোই
আজমীর ছোড়কে চলে যানা।
নেহি তো জরুর খতম হো
যায়েগা।
ইয়াদ রাখনা, ম্যয়
বহৎ খতেরনাক আদমী।

মণীশ শুনে বলল,—'এই চিঠির কথা বোধহয় এখানকার পুলিসকে ইনফর্ম করা উচিত।'

কিন্তু রতীশ মাথা নাড়ল। বলল,—'আমার কি মনে হচ্ছে জানিস ?'

—'কি ?' তিনজনে সাগ্রহে তাকাল।

রতীশ হেসে বলল,—'চিঠিতে যতই তড়পাক, ওরা এবার ভয় পেয়েছে।'

॥ নয় ॥

খোঁজ নিয়ে জানা গেল নাগ-পাহাড় শুধু একটা পাহাড়ের নাম। ওটা পুষ্কর হ্রদের খানিকটা পেছনে। পুষ্কর থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা সাবিত্রী পাহাড়ের দিকে গেছে নাগ-পাহাড় তার বাঁদিকে পড়ে।

বাসে করে চারজনে যখন পুষ্করে এসে নামল, তখন ঘড়িতে প্রায় ন'টা বাজে। রতীশের নির্দেশ মতো মণীশ, মিলন আর সোমেন তিনজনেই ছাত্রের বেশে খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে বাসের পাদানী ছেড়ে মাটিতে নামল।

রতীশ বলল,—'আজমীরে অনেক কিছু দেখার আছে। তার মধ্যে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা এবং নয় 'শ বছর পূর্বের কৃত্রিম মনোরম হ্রদ আন্নাসাগর খুবই দর্শনীয়। তারপর এই পুষ্কর, হিন্দুদের এক প্রাচীন তীর্থ। কিন্তু আমরা তো আর তীর্থ করতে আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য হল, রতনকে খুঁজে পাওয়া এবং তাকে সর্বাগ্রে উদ্ধার করা। পরে সময় পেলে না হয় পুষ্করে পুজো-টুজো দিয়ে পুণ্যার্জন করা যাবে।'

পুষ্কর হ্রদ আসলে একটা বড় মাপের দীঘি। জলে রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট প্রমাণ সাইজের রুই-কাতলা, মহাশোল নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তীর্থযাত্রীরা তাদের খাবার ছুঁড়ে দিলেই নিমেষে জলের ওপর ভেসে উঠে সেগুলি গলাধঃকরণ করেই ফের অতলে ডুব দিচ্ছে।

পুষ্কর পেছনে ফেলে তিনজনে এগোল। সামনে সাবিত্রী পাহাড়। কাঁচা রাস্তা। নেহাৎ এ অঞ্চলে মাটি শক্ত, তাই পথের ওপর পাথুরে কাঁকর এমনি ছড়িয়ে আছে।

রতীশ বলল,—'গাইড গোছের একজন কাউকে পেলে খুব ভালো হত।'

মণীশ জানাল,—'বাস থেকে নামতেই দু-তিনজন লোক তো এসেছিল। ওদের কাউকে গিয়ে ডেকে আনব?'

রতীশ মাথা নাড়ল। বলল,—'কোনো পেশাদার গাইড নিলে অসুবিধে আছে। নাগ-পাহাড় যাওয়ার কথা শুনলে সে নিশ্চয় আমাদের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করবে। এখনই সমস্ত কিছু ফাঁস হলে রতনকে উদ্ধার করা হয়তো খুব শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

সামনেই একটা মাটির বাড়ি, খড়ের চাল। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে তাদের লক্ষ্য করছিল। কী মনে হতে রতীশ ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকল। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, —'নাগ-পাহাড়ে যাওয়ার রাস্তাটা তুমি দেখিয়ে দিতে পারবে?'

'নাগ-পাহাড়?'—মেয়েটি খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। বলল,—'নাগ-পাহাড়ে তো কেউ যায় না। বাঙালীবাবুরা তো শুধু সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠে।'

মণীশ বলল,—'আমরা স্টুডেন্ট—ছাত্র। নাগ-পাহাড়ের গাছপালা আর মাটি চিনব বলেই টিচারের সঙ্গে এতদূর এসেছি।'

মেয়েটি বোধহয় তার কথা বিশ্বাস করল।

মিলন জিজ্ঞাসা করল,—'নাগ-পাহাড়ে বুঝি কেউ বাস করে না?'

'কেন করবে না?'—মেয়েটি ফের হাসল। বলল, 'দেহাতী লোকে বাস করে। পাহাড়ে উঠলেই ওদের ডেরা দেখতে পাবে।'

'বাড়িতে তোমার মা-বাবা নেই? কোথায় তারা?'—রতীশ শুধোল।

'কেন থাকবে না?'—মেয়েটি হেসে জবাব দিল। বলল,—'মা তো রসুইঘরে কাজ করছে। আর আমার বাবা এখানকার একজন গাইড।'

—'গাইড?'

—'হ্যাঁ। ট্যুরিস্টদের নিয়ে পুষ্করতীর্থের সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দেখায়। সকাল হলেই বাস স্ট্যাণ্ডে যায়। ফিরতে বেলা বারোটা, কোনদিন একটা বাজে।'

রতীশ খুশি হয়ে বলল,—'তুমি একজন গাইডের মেয়ে? তাহলে নিশ্চয় আমাদের পথ দেখিয়ে নাগ-পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

মেয়েটি রাজি হল। তবে পাঁচটি টাকা তার পারিশ্রমিক চাই।

রতীশ এতে আপত্তি করল না। যখন গাইডের কাজ করবে তখন নিশ্চয় টাকা চাইতে পারে। আর যেহেতু এখানেই বসবাস, সে-কারণে নিশ্চয় এ তল্লাটের মানুষজনের অনেক খোঁজখবর রাখে।

মেয়েটি জামা-কাপড় বদলাতে ভেতরে গেল। মণীশ, সোমেন আর মিলন বাড়ির সামনে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে। বাইরের ঘরটা বৈঠকখানা গোছের। একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার, টেবিল, ছোট একটা চৌকিও আছে। রতীশ চেয়ারে বসে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আর একবার ছকে নিচ্ছিল। হঠাৎ দেয়ালে নজর পড়তেই সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল। আশ্চর্য! চোখের সামনে রতীশ এখন কী লক্ষ্য করছে? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও যেন এই মুহূর্তে দিবালোকের মতো স্বচ্ছ। রতনের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু রতীশ বিন্দুমাত্র উত্তেজিত কিংবা চঞ্চল হয়নি। যেন ওটা কিছু নয়, এমনি ভাবেই সে চুপ করে বসে রইল। ছেলেগুলোকে এই মুহূর্তে বোধহয় এটা জানানো ঠিক কাজ হবে না।

মেয়েটি বেরিয়ে আসতেই রতীশ তাকে আড়ালে নিয়ে গেল। মণীশকে বলল, 'তোরা এখানেই থাক। এর সঙ্গে দুটো কথা বলি।'

মেয়েটি বেশ চটপটে, সপ্রতিভ। হাজার হোক গাইডের মেয়ে। কথাবার্তা তাড়াতাড়ি বোঝে।

রতীশ জিজ্ঞাসা করল,—'পুষ্কর তো ছোট জায়গা। তুমি এখানকার সব লোককে চেন?'

—'হ্যাঁ। কেন চিনব না?'—মেয়েটি বাকিটুকু শোনার জন্য জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

—'আমি একজন লোকের খোঁজ করছি।'—রতীশ নিজেই বলল,

'নাগ-পাহাড়ের কাছেই তার বাড়ি। কিন্তু ওর নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।'

মেয়েটি খুব বুদ্ধি খাটিয়ে প্রশ্ন করল,—'তাকে দেখতে কেমন? মানে খুব লম্বা কিংবা বেঁটে? কী কাজ করে বলতে পারবেন?'

রতীশ এবার মাথা চুলকে বলল,—'কিছুদিন আগে ও কলকাতায় মানে বাঁকুড়াতে গিয়েছিল। বেশ তাগড়া চেহারা। আর চওড়া বাহারি জুলপি। এছাড়া ওর বাঁ দিকের কানের অর্ধেকটা নেই।'

—'ও হো!'—মেয়েটির মুখখানা এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আপনি তাহলে ছটুলালকে খুঁজছেন? এ তল্লাটে বাঁ কান কাটা লোক তো একটাই আছে। তার নাম ছটুলাল।'—এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে ফের চাপা গলায় জানাল,—'লেকিন বহৎ খতেরনাক আদমী। একবার ডাকাতি করে জেল খাটতে গিয়েছিল।'

বহৎ খতেরনাক্ আদমী। শব্দ কটি রতীশ স্বগতোক্তির মতো আর একবার অস্ফুটে উচ্চারণ করল। আজ সকালে যে চিঠিখানা পেয়েছে তার শেষেও ওই ক'টি শব্দ লেখা। তাহলে রতনকে যারা কিডন্যাপ্ করে এনেছে, সেই দুষ্টচক্রের সন্ধান এখন আর সম্পূর্ণ অজানা নয়। দলের চাঁইয়ের নাম ছটুলাল। লোকটা জেলখাটা আসামী।

রতীশ তবু জিজ্ঞাসা করল,—'ছটুলালের জেল হয়েছিল?'

'হাঁ। তবে এখন ইসব কাম ছেড়ে দিয়েছে। কোন গাঁয়ে কাজিয়া করতে গিয়েই তো বাঁ কানের অর্ধেকটা কাটা গেছে।'

রতীশ শুধোল,—'ছটুলাল এখানেই আছে?'

'হাঁ। কাল ভি তাকে দেখেছি। দুকানে বসে মাল বেচছিল।'

—'দোকান? ছটুলালের দোকান আছে নাকি?'

—'হাঁ, একঠো নেহি। দুঠো দুকান। এখন তো ভাল কামাই করে। আজমীরে ভি একঠো দুকান আছে। সেটা ওর ভাই দেখে।'

—'ছটুলালের দোকানটা কোথায়?'

—'কেন, আসবার সময় দেখতে পাননি? ওই তো বিষ্ণুমন্দিরের

ঠিক উল্টোদিকে।'—ঈষৎ চিন্তা করে সে ফের বলল,—'দুকানের নাম ভেরাইটি স্টোর্স।'

—'ছটুলাল এখানে থাকে কোথায় ?'

—'তার কোনো ঠিক নেই। নাগ-পাহাড়ে, দেহাতে ওর বউ-বাচ্চা আছে, সেখানেও থাকে। কভি পুষ্কর, নেহি তো আজমীরের দুকান ঘরে ঘুমিয়ে রাত কাটায়।'

রতীশ বুঝতে পারল মেয়েটি বুদ্ধিমতী। কার কী ব্যবসা, কোথায় থাকে মোটামুটি সব খোঁজ রাখে। একে সঙ্গে নিলে নাগ-পাহাড়ে ছটুলালের ডেরায় গিয়ে পৌঁছান বেশ সহজ হবে।

হঠাৎ পেছন ফিরে তাকিয়ে মণীশকে উদ্দেশ করে সে বলল, —'সিগারেট ফুরিয়ে গেছে বুঝলি ? বিষ্ণুমন্দিরের কাছে একটা ভাল দোকান দেখলাম। যাই, সেখান থেকেই দুটো প্যাকেট কিনে আনি।'

মণীশ বলল,—'আমরা তাহলে এখানেই অপেক্ষা করি ?'

—'হ্যাঁ।'—রতীশ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল। যেতে যেতে ফের মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ভয় নেই। আধঘণ্টার বেশী দেরি হবে না।'

ভ্যারাইটি স্টোর্সের সামনে যেতেই ব্যাপারটা রতীশের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। দোকানের ভেতরে অবশ্য ছটুলাল নেই। তার কোন কর্মচারী এক বিদেশী দম্পতিকে জিনিসপত্র দেখাচ্ছে। রতীশ দোকান ঘরটার চারদিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে ছোট একটা কাঠের জিনিস কিনল। এখন অফ-সীজন, ট্যুরিস্টের ভিড় কম। বাঙালী ট্যুরিস্ট তো চোখে পড়েনি। সম্ভবতঃ সে কারণে তারা চারজন বাস থেকে নামতেই ছটুলালের লোকেরা সন্দেহ করে। তারপর হয়তো ওই টাঙাওয়ালাকে হোটেলের গেটের সামনে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিল। মিলনের মুখে তারা পরদিন নাগ-পাহাড় যাবে শুনে টাঙাওয়ালা তখুনি চম্পট দেয়। সে খবর পেয়েই ছটুলাল ট্যুরিস্ট লজে চলে আসে। তারপর লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে সোমেনের দিকে বায়সের মতো সন্দিগ্ধ চোখে কটমট করে তাকিয়েছিল।

॥ দশ ॥

রতীশ ফিরল প্রায় পৌনে একঘণ্টা বাদে। ভ্যারাইটি স্টোর্স থেকে বেরিয়ে সে অন্য এক জায়গায় গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না। এখন শেষ মুহূর্তে কী ঘটবে তা সে নিজেও বলতে পারে না। ছটুলালের যা পরিচয় শুনল, তাতে লোকটা যে সুবিধের নয়, তা বোধহয় না বললেও চলে। একটা জেলখাটা আসামী, ডাকাতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে কত বছর যে লৌহকপাটের আড়ালে ঘানি ঘুরিয়ে এসেছে তা ওই জানে!

রতীশ ফিরে আসতেই সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করল,—'এত দেরি হল যে?'

—'সিগারেটটা কোথাও পাইনি। শেষে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায়'—এক গাল হেসে রতীশ ফের বলল,—'তাতেই একটু দেরি হয়ে গেল।'

মেয়েটি তাদের পথ দেখিয়ে নাগ-পাহাড়ে নিয়ে চলল।

মণীশ বলল,—'রতনকে সঙ্গে করে না ফিরলে মেসোমশায়ের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।'

মিলন বলল,—'ক্লাসসুদ্ধু ছেলে আমাদের কি বলবে?'

রতীশকে হঠাৎ খুব গম্ভীর দেখাল। তার কপালে চিন্তার রেখা। ধীরে ধীরে সে বলল,—'রতনকে আজ উদ্ধার করতেই হবে। নইলে হয়তো তার একটা বড়ো রকমের বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

পাহাড়টা প্রায় দু-হাজার ফুট উঁচু। মেয়েটি বলল,—'এর ওপর তিনটে গাঁও আছে। দেহাতী লোক সব থাকে। গত বছর শীতকালে একটা চিতাবাঘ এসেছিল। গরু-বাছুর মারে। একদিন দুটো রাখাল ছেলের ওপর হামলা করেছিল। ছেলে দুটো কোনো-

রকমে পালিয়ে আসে। তারপর জয়পুর থেকে মহারাজার শিকারী এসে গুলি চালিয়ে বাঘটাকে খতম করল।'

রতীশ হঠাৎ মাস্টারী ঢঙে বলে উঠল,—'স্টুডেন্টস্, তোমরা এখানকার গাছের পাতা, দু-একটা পাথর সংগ্রহ করে রাখ। কলকাতায় ফিরে এক্সকারসনের রিপোর্ট দেবার সময় ওটা কাজে লাগবে।'

একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে সোমেন পাতা খুঁজছিল। হঠাৎ দলা পাকানো খানিকটা কাগজ চোখে পড়তেই সে হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিল। এক নজর চোখ বুলিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—'মণীশদা, এ তো রতনের অ্যালজেব্রা বইয়ের পাতা।'

রতীশ এগিয়ে এসে ছেঁড়া দলা পাকানো কাগজটা পরীক্ষা করে বলল,—'হ্যাঁ, অ্যালজেব্রা বইয়ের পাতা। মনে হচ্ছে আমরা লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি চলে এসেছি।'

মণীশ হঠাৎ একটা সিগারেটের খালি প্যাকেট কুড়িয়ে অস্ফুটে বলে উঠল,—'রতীশদা, এই রকম একটা খালি প্যাকেট সেদিন রতনের পড়ার ঘরেও পেয়েছি।'

রতীশ হাত বাড়িয়ে সেটি নিয়ে একবার দেখল।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাহাড়ের ওপর থেকে একটা বেয়াড়া সাইজের বিরাট পাথর সশব্দে তাদের দিকে গড়িয়ে এলো। ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটল যে সকলে দৌড়ে সরে যাবার সময়টুকু পায়নি। পাথরটা প্রায় লাফাতে লাফাতে ভীম বেগে গড়াচ্ছে। মণীশ আর মিলন দুজনেই বাঁদিকে লংজাম্প মেরে নিজেদের কোনক্রমে বাঁচাল। রতীশ গাইড মেয়েটির হাত ধরে কোনমতে ডানদিকে সরে গেল। এদিকটা গর্তের মত, নিচেটা এবড়ো-খেবড়ো। সোমেন টাল সামলাতে না পেরে প্রায় দশ হাত গভীরে গিয়ে পড়ল।

মণীশ ছুটে এল। বাঁকুড়া থেকে নিয়ে আসা শক্ত দড়িটা রোল করে সোমেনের দিকে ছুঁড়ে দিতেই সে খপ করে অপর প্রান্ত

চেপে ধরল। তারপর মণীশ আর মিলন দুজনে মিলে তাকে টেনে ওপরে তুলল।

কাণ্ড দেখে মেয়েটি হতবাক। কয়েক মুহূর্ত পরে গম্ভীর মুখে সে



রতীশ গাইড মেয়েটির হাত ধরে কোনমতে ডানদিকে সরে গেল। [পৃঃ ৬৩

বলল,—'বাবুজী, এ কোন খতেরনাক আদমীর কাজ। আপনার ওপর ওর রাগ আছে।'

রতীশ চুপ করে কি যেন ভাবল। কোন জবাব দিল না।

পাহাড়টার তিনদিকে- তিনটে চূড়োর মতো। মেয়েটি বলল,

—'দেহাতী গাঁও সব ওব পেছনে। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু রাস্তা। পাশাপাশি দুজন লোক হাঁটতে পারে।'

কাছে এসে মণীশ চাপা গলায় বলল,—'রতনকে ওরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে রতীশদা? এখানে পুলিসের সাহায্য নিলে হত না?'

'না।'—রতীশ মাথা নাড়ল। বলল,—'বরং তাতে ক্ষতি হতে পারে। সেই কানকাটা লোকটা যদি সাংঘাতিক প্রতিশোধ নেয়?'

—'প্রতিশোধ?'

—'হ্যাঁ। যেমন ধর, রতনকে হাত-পা বেঁধে পাহাড়ের ওপর থেকে খাদের মধ্যে ফেলে দিল। তাহলে আব কোনদিন ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে?'

রতীশ চিন্তা করে কূল-কিনারা পাচ্ছিল না। এই পাহাড়ে রতনকে কোথায় ওবা লুকিয়ে রেখেছে? তাদের গাইড মেয়েটি তো বলল, পাহাড়ের ওপরে দেহাতীদের তিনটে গাঁ আছে। এত বড় পাহাড়ে রতনকে খুঁজে বের করা তো প্রায় খড় গাদায় ছুঁচ খোঁজার সামিল হবে। তারপব প্রতি পদে বিপদ,…একটা রিস্কও নিশ্চয় আছে। এই বাচ্চা ছেলেগুলোর যদি হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা হয় তাহলে সেজন্য রতীশও খানিকটা দায়ী হবে। একবার মনে হ'ল সমস্ত ঘটনা এখানকার পুলিসকে জানালেই বোধহয় ভালো হ'ত। তারা নিশ্চয় পাহাড়টাকে ঘিরে একটা তল্লাসী চালাত। তাতে অবশ্য রতনের কিছুটা বিপদের আশঙ্কা ছিল। ধরা পড়ার ভয়ে ছটুলাল হয়তো খাদে-খন্দে কোথাও ছেলেটার লাশ ফেলে দিয়ে অনায়াসে ভোল পাল্টে নিপাট ভালোমানুষ সাজতে পারত।

•

হঠাৎ মেঘ না চাইতেই জল। প্রায় এগারোটা তখন। খানিকটা ওপরে যেতেই কাগজে জড়ানো একটা ঢিল টুপ করে মণীশের পায়ের কাছে এসে পড়ল। রতীশ সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চোখ বুলোল। পর মুহূর্তেই তার মুখখানা উজ্জ্বল, খুশি-খুশি দেখাল। বলল,—'অ্যাই ছাখ, রতনের খোঁজ পেয়েছি।'

—'কোথায় ? কোথায় সে ?'—তিনজনে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

—'তা বলা যাবে না। তবে মনে হয় খুব কাছেই। অ্যাই ছাখ, রতন এই কাগজটায় কি লিখেছে—

মণীশদা,

এখান থেকে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, তার অনেকখানি ওপরে মানে বেশ উঁচুতে একটা গুহার ভিতরে আমি বন্দী। দুটো লোক দিন-রাত্রি পাহারা দিচ্ছে। ওরা গুহার মুখে বসে থাকে। তাই পালাবার উপায় নেই। দুপুরবেলা আর সন্ধ্যের একটু আগে একটা লোক থালাতে খাবার রেখে যায়— মোটা রুটি, ডাল-তরকারি আমি একটুও খেতে পারি না। ওদের কানকাটা সর্দারটা রোজ সকালে একবার করে আসে আর শাসিয়ে যায়। ওর কথামত কাজ না করলে আমাকে মেরে ফেলবে। তাড়াতাড়ি, মানে পারলে আজই আমাকে উদ্ধার কর মণীশদা। নইলে কি হবে তা জানি না।'

সোমেন বলল,—'চিৎকার করে রতনকে ডাকব ?'

—'পাগল হয়েছিস ?'—মণীশ তাকে সাবধান করল। 'তাহলে ওই কানকাটা বদমাশটা ওকে গুম করে ফেলবে।'

রতীশ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল,—'এখানে কাছেই কোন গুহা আছে জান ?'

—'গুহা ?'—মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে এক মিনিট চিন্তা করল। ফের বলল,—'হাঁ, এই তো পাহাড়ের মাথায়। আমি একবার গেছি। লেকিন সেখানে যেতে পারবেন ?'

—'কেন ? যাবার রাস্তা নেই ?'

—'না। এমনি পাহাড়ের ওপর দিয়ে গাছপালা ধরে মেহনত করে যেতে হবে। হাত-পা কেটে যেতে পারে।'

রতীশ বলল,—'পা-হাত ছড়ে গেলেও আমাদের সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। একটা বাচ্চা ছেলেকে ওরা সেই গুহাতে বন্দী করে রেখেছে।'

সামান্য কথায় মন্ত্রের মতো কাজ হল। মুহূর্তে মেয়েটির চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। ঘৃণায় মুখখানা কুঁচকে সে বলল,—'এ নিশ্চয় ওই ছটুলালের কাজ। শয়তান এখন লেড়কা গায়েব করে টাকা কামাই করতে চাইছে।'

রতীশ চুপ করে রতনের চিঠিটার কথা চিন্তা করছিল। কানকাটা ছটুলাল ওকে রোজ সকালে এসে শাসিয়ে যায়। তার কথামতো কাজ না করলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ভয় দেখায়। তাহলে, যে উদ্দেশ্যে রতনকে ওরা কিডন্যাপ করে এনেছে তা নিশ্চয় এখনও সফল হয়নি।

সোমেন বলল,—'রতীশদা, গুপ্তধনের সেই নকশাটা রতন নিশ্চয় এখনও হাতছাড়া করেনি। তাই কানকাটা বদমাইশটা ওকে শাসিয়ে যাচ্ছে।'

মিলন বলল,—'এমনি কোন দুর্গম গুহাতেই বোধহয় সেই গুপ্তধনের সন্ধান মিলবে। রতনের কাছ থেকে নকশাটা পেলে আমরা নিশ্চয় সেখানে যাব।'

মেয়েটি বলল,—'বাবুজী, আমি একটা অন্য পথ জানি। লেকিন যেতে একটু ঘুর হবে। তবে ওই ছটুলাল কিছুতেই টের পাবে না। চুপচাপ গুহার পেছনে গিয়ে উঠবেন।'

রতীশ একটু ভেবে বলল,—'সেই রাস্তায় গেলে গুহাতে পৌঁছতে কত সময় লাগবে?'

—'ধরুন আধঘণ্টার বেশী। লেকিন যেতে বহৎ তকলিফ হবে।'

মণীশ বলল,—'কষ্ট যা-ই হোক, তবু সেখানে পৌঁছান চাই। নইলে ছেলেটার যে কি হবে!'

॥ এগারো ॥

হঠাৎ যেন পাহাড়ের ওপরে একটা তীক্ষ্ণ বোঁ-বোঁ আওয়াজ শোনা গেল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তারপরই রতীশ সভয়ে তাকিয়ে দেখল অসংখ্য বোলতা যেন ক্রুদ্ধ গর্জনে চতুর্দিক কম্পিত করে শত্রুর খোঁজে নেমে আসছে। কি সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। রতীশ অস্ফুটে শুধু বলল,—'পাহাড়ী বোলতা। ওর কামড়ে মানুষ তো ছার, একটা তেজী ঘোড়া পর্যন্ত যন্ত্রণায় পাগল হয়ে প্রাণ হারায়।'

—'তাহলে কি হবে ?' সোমেন ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

বোলতাগুলো বোঁ-বোঁ আওয়াজ করে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সামনে পেলেই হুল ফুটিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবে না।

মিলন বলল,—'পালিয়ে চলুন রতীশদা। আর দেরি করলে নির্ঘাত মারা পড়ব।'

—'অমন কাজ করবেন না।' সেই গাইড মেয়েটি এবার সাবধান করল। বলল,—'তাহলে আর রেহাই নেই। বোলতার ঝাঁক আপনার পিছনে ছুটবে। যতক্ষণ না সকলে হুল ফুটিয়ে আপনার শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ ছাড়বে না।'

কি মনে হতে রতীশ হঠাৎ বলে উঠল,—'তাড়াতাড়ি সকলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। বোলতা কিংবা মৌমাছি বোধহয় মাটিতে নেমে কাউকে কামড়ায় না।'

মণীশ রাগে গরগর করে বলল,—'এ ঠিক ওই শয়তান ছটুলালের কাজ। পাহাড়ের ওপরে বোলতার চাকে ধোঁয়া দিয়েছে কিংবা ঢিল মেরেছে। তাই বোলতাগুলো অমন বোঁ-বোঁ আওয়াজ করে চতুর্দিকে শত্রুর খোঁজে বেরোতে দেরি করেনি।'

অবশ্য রতীশের কথা ঠিক হ'ল। বোলতাগুলো তাদের ওপর দিয়ে উড়ে বহুদূরে নতুন চাক বাঁধতে বোধহয় চলে গেল।

সকলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

মেয়েটি পাহাড়ের ওপর থেকে খানিকটা নেমে গাছপালার ভেতর দিয়ে অন্য একটা গুপ্ত পথ ধরল। দুপাশে এক ধরনের কাঁটা গাছ।



পাহাড়ী বোলতা। ওর কামড়ে··· [পৃঃ ৬৮]

মাঝে মাঝে গায়ে লেগে হাত-পা কেটে যাচ্ছে। তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনিভাবে কিছুদূর গিয়ে সে থামল। সামনে শুধু পাথরের চাঁই। মেয়েটি সেদিকে তাকিয়ে বলল,—'বাবুজী, এবার তো মেহনত করে উপরে উঠতে হবে।'

—'পরোয়া নেই।' রতীশ নির্বিকার। বলল,—'এমনি সমস্যা দেখা দিতে পারে জেনেই আমি পাহাড়ে চড়ার কিছু সরঞ্জাম সঙ্গে এনেছি।' —বলেই রতীশ তার থলির ভিতর থেকে পাহাড়ে ওঠার উপযোগী কয়েকটা জিনিস বের করল।

একটা শক্ত দড়ির ডগায় আঁকশির মতো কী যেন লাগান। সেটা শূন্যে ছুড়ে দিতেই শক্ত একটা পাথরের চাঁইয়ের মাথায় দিব্যি লেগে গেল। কয়েকবার সেটা টেনে শক্ত কিনা পরীক্ষা করে রতীশ দড়ির সাহায্যে পাথরের চাঁই ডিঙিয়ে ওপরে উঠে গেল। তার দেখাদেখি মণীশ, মিলন আর সোমেন তিনজনেই দড়ি ধরে ওপরে উঠল। মেয়েটির কিন্তু দড়ির সাহায্য লাগল না। সে পাথরের খাঁজে পা রেখে অনায়াসে ওপরে উঠে পড়ল।

এ জায়গাটা গুহার ঠিক পিছনে। পা টিপে টিপে শিকারী বিড়ালের মতো চারজনে এগোচ্ছিল। রতীশ আর সোমেন একদিকে, অন্যদিকে মণীশ আর মিলন। রতন যা বলেছিল ঠিক। গুহার সামনে দুটো লোক বসে। বোধহয় সমস্ত রাত্তির আধো জাগরণ। তাই এখন চোখ দুটি ঢুলু-ঢুলু, ঝিমুনি এসেছে।

সেই কানকাটা লোকটা কোথায় গেছে কে জানে। হয়তো এতক্ষণ পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে রতীশ এবং অন্যান্যদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল। তারপর ওই পাহাড়ী বোলতার ঝাঁক তাড়া করতেই ওরা যে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে সবস্তুত সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই ওদের দেখতে না পেয়ে ছটুলাল নিশ্চয় তার ডেরায় ফিরে গেছে কিংবা পাহাড়ে কোথাও শুয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। রতীশ তাই আর দেরি করল না। বিড়ালের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে আচমকা পেছন থেকে একজনের মুখ চেপে ধরে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করতেই লোকটা গোঁ-গোঁ করে একটা অব্যক্ত আওয়াজ করল।

তারপর ধীরে ধীরে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেই রতীশ তাকে ছেড়ে দিল। তার সঙ্গী ততক্ষণে সজাগ হয়ে গেছে। বন্ধুর ওই চিৎপটাং অবস্থা দেখে লোকটা সট্‌কে পড়বার চেষ্টা করছিল। কিন্তু

মিলন দ্রুত শুয়ে পড়ে একটি মোক্ষম ল্যাং দিতেই সে হুমড়ি খেয়ে সামনে গড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই মণীশ বাঘের মতো লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরল। ইতিমধ্যে সোমেন সেই দড়িটা বের করে তার হাত-পা বেঁধে ফেলতে লেগেছে। লোকটার আর প্রতিরোধ করবার সামর্থ্য ছিল না। সে প্রায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

পকেট থেকে ছোট্ট টর্চটা বের করে রতীশ বলল, তোরা এখানেই থাক। আমি গুহার ভেতরে ঢুকে রতনকে বের করে আনি। কিন্তু সাবধান, কোন বিপদের গন্ধ পেলেই সিটি বাজিয়ে আমাকে জানাবি।

গুহাটা সুড়ঙ্গের মতো। প্রান্তে একটা ছোট ঘুলঘুলি। সেই ফাক দিয়ে যা একটু আলো আর বাতাস এসে ঢুকছে। টর্চ লাইটের ফোকাস হতেই রতন দৌড়ে এল। প্রথমটা তা'কে দেখে থতমত খেল। পরক্ষণেই উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'মণীশদা, মণীশদা কোথায় ?'

—'ওরা বাইরে। তুমি এখুনি চলে এস।'

—'আপনি ?'—রতন সতর্ক দৃষ্টিতে তার মুখের ওপর চোখ বুলোল।

—'আমি রতীশদা। তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

শুনে রতন তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

গুহার বাইরে পা দিয়ে রতীশ সর্বাগ্রে বলল,—'আমাদের বিপদ এখনও কাটেনি। সেই কানকাটা শয়তানটা হয়তো মোক্ষম আঘাত করবে বলেই গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে।'

রতীশ চারপাশে লক্ষ্য করছিল। ছটুলালকে বিশ্বাস নেই। জেলখাটা আসামী তো। আচমকা যে তাদের ওপর চড়াও হবে না, জোর করে এমন কথা কে বলতে পারে ?

আশ্চর্য ! তখুনি মূর্তিমান কৃতান্তের মতো কানকাটা ছটুলাল একটা উন্মুক্ত তরবারি হাতে সামনে এসে দাঁড়াল। কুৎসিত মুখভঙ্গি করে প্রথমেই মেয়েটাকে খতম করবে বলে শূন্যে তরবারি তুলল। রতীশ

আর দেরি করল না। তার হাতের '৩৮ বোরের অটোমেটিক রিভলবার মুহূর্তে গর্জে উঠল। নিখুঁত লক্ষ্য। গুলিটা হাতে লাগতেই তরবারিটা ঝনঝন শব্দে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ল। কিন্তু ছটুলাল জ্যান্ত শয়তান। ওই অবস্থাতেই শুয়ে পড়ে পায়ের সাহায্যে রতীশকে



প্রথমেই মেয়েটাকে খতম করবে বলে শূন্যে তরবারি তুলল। [পৃঃ ৭১

বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করতেই মণীশ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকের ওপর চেপে বসতে সে নিরস্ত হ'ল।

ইতিমধ্যে মিলন আর সোমেন দড়ি দিয়ে ছটুলালকে বেঁধে

ফেলেছে। গুলি লেগে ডান হাতটা অকেজো, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, তাই বাধা দিতে পারেনি।

রতীশ রিভলবারটা মণীশের দিকে এগিয়ে দিল। বলল,—'চালাতে চাস? শূন্যে তুলে দুবার ফায়ার কর, তোর প্র্যাকটিশ হবে।'

দুটো ফাঁকা আওয়াজ হবার মিনিট তিন-চার পরেই পাহাড়ের নিচে থেকে কারা হুইসিল বাজিয়ে প্রত্যুত্তর দিল।

রতীশ বলল,—'আর চিন্তা নেই। থানার পুলিস এসে পড়েছে। এখানে আসার আগে লোক্যাল থানায় সব জানিয়ে এসেছিলাম। দুবার গুলির শব্দ পেলেই পুলিস যেন বিপদ মনে করে ছুটে আসে।'

তিন জনকে আগেই ওরা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে। রতন বলল,—'খুব সময়ে তোমরা এসে পড়েছিলে। নইলে ওই কানকাটা শয়তান বলেছিল যে, আজ রাত্তিরে তরবারি দিয়ে আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।'

—'এখন আর সে ভয় নেই' মিলন একগাল হাসল। বলল,—'তোর সেই গুপ্তধনের নকশাটা কোথার? চটপট বের কর।'

—'গুপ্তধনের নকশা?' রতন যেন আকাশ থেকে পড়ল।—'নকশা কোথায় পাব?'

—'তার মানে?' সোমেন প্রায় ধমক দিল।—'গুপ্তধনের নকশা অথবা ঐ জাতীয় কিছু আছে বলেই তো ছটুলাল তোকে কিডন্যাপ্ করে নিয়ে এসেছে!'

রতীশ মধ্যস্থতা করল,—'তোমাদের বোধহয় একটু ভুল হচ্ছে। আচ্ছা, সেই ধাঁধাটার উত্তর জিজ্ঞাসা করেছিলে না? আমি কিন্তু সেটা এখনই বলতে পারি, বুঝলে?'

—'কি উত্তর রতীশদা?' মিলন আর সোমেন সমস্বরে বলল।

মণীশ স্বীকার করল,—'ওই ছ'টা সংখ্যার রহস্য তো কিছুতেই আমার মগজে আসছে না।'

রতীশ মিষ্টি হেসে বলল,—'ধাঁধাটা তো এই—

···নয় দিয়ে শুরু আর, নয় দিয়ে শেষ
দুই পাশে দুই ছয়, দেখে লাগে বেশ।
মাঝখানে জোড়া তিন, আর নেই ঠাঁই
ধাধাটার উত্তর দিতে পার ভাই ?'···

সোমেন খুশি হয়ে বলল—,'হ্যাঁ, এই তো ধাঁধা।'

রতীশ মুচকি হেসে জানাল,—'তাহলে উত্তরটা শোন—

ওই ছয় সংখ্যার কিনিল টিকিট
ভাণ্ডার লটারিতে করিল সে হিট্।
ফার্স্ট প্রাইজ তার পাঁচ লাখ টাকা
রতনের কপালেতে ছিল সেটা লেখা।'

মণীশ চিৎকার কয়ে শুধোল,—'রতন, তাই কি সত্যি ?'

—'হ্যাঁ মণীশদা। কিন্তু আমার টিকিটে যে ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছে, সে কথা ওই ছটুলাল একবারও বলেনি।' উল্লাসে রতন আত্মহারা। মনের আনন্দে নিজেই এবার তার নিখোঁজ হওয়ার রহস্য বলে গেল।

বারো

গত ডিসেম্বরে যখন সে জয়পুরে আসে, তখন আজমীর আর পুষ্করেও বেড়াতে এসেছিল। এখানে ওই কানকাটা লোকটার কাছে একটা লটারিব টিকিট কিনল। এমনি খেয়ালবশে, তখন স্বপ্নেও ভাবেনি তার টিকিটে পাঁচ লাখ টাকার প্রাইজ উঠবে। লোকটাকে তার বাঁকুড়ার ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, প্রাইজ পেলে যেন চিঠি লিখে জানায়।

তারপর ওই টিকিটের কথা সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। শেষে একদিন হঠাৎ নাগ-পাহাড়েব ওই লোকটার সঙ্গে বাঁকুড়ার রাস্তায় দেখা। তখন কিন্তু তাকে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার খবর সে দেয়নি। উল্টে বলেছিল, টিকিটের নম্বরে কী যেন গণ্ডগোল ধরা পড়েছে। তাই পরদিন সন্ধ্যের সময় লটারির টিকিটটা নিয়ে যেন ভৈরবস্থানের কাছে তার সঙ্গে একবার দেখা করে। আর এই ব্যাপারটা যেন এখনই বাড়ির কাউকে না জানায়।

রতন আবার শুরু করল,—'আমার কিন্তু তখনই সন্দেহ হল। শুধু নম্বরের গণ্ডগোল দেখতে লোকটা নাগ-পাহাড় থেকে এতদূর ছুটে এসেছে? তাই টিকিটটা ভাল করে লুকিয়ে সন্ধ্যের পর ওর কাছে গেলাম। ওটা নিয়ে যাইনি শুনে লোকটা প্রথমেই খিঁচিয়ে উঠল। আমি বললাম—টিকিটটা তো পড়ার ঘরে অ্যালজেব্রা বইয়ের মধ্যে রয়েছে। কালই সেটা নিয়ে আসতে পারি। শুনে লোকটা খুশি হল। সে ইঙ্গিত করতেই অন্য দুজন লোক ঘরের ভেতর থেকে দু গ্লাস শরবত নিয়ে এল। একটা গ্লাস তাকে দিল, অন্যটা আমাকে। খানিকটা খেতেই কেমন মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। তারপর আর কিছু মনে রইল না। শুধু একটা ঘোরের মধ্যে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম, ঝমাঝম্ ঝমাঝম্। খটাখট্ খটাখট্। কেউ যেন বলছে,—

'ভারি বুখার। তাই চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে। তারপর ভাল করে জ্ঞান হতেই দেখলাম, এই গুহার ভেতরে বন্দী।'

মিলন জিজ্ঞাসা করল,—'অ্যালজেব্রা বইয়ের মধ্যে টিকিটটা নিশ্চয় ওরা পায়নি ?'

—'পাবে কেমন করে ? টিকিট তো আর ওখানে ছিল না।' রতন মুচকি হাসল।

—'তা টিকিটটা না পেয়ে ছটুলাল রেগে যায়নি ?'

—'ওরে বাবা! সে কি রাগ। ঠিক যেন খ্যাপা ষাঁড়ের মতো গজরাচ্ছিল।' রতন মুখখানা ঈষৎ ছুঁচোলো করে একটা বিকৃত ভঙ্গি করল। বলল,—'আমার ওপর কি হম্বিতম্বি। হাত-পা বেঁধে একদিন সারারাত্তির ফেলে রাখল। শাসিয়ে বলল,—'টিকিট না বের করে দিলে আমাকে খতম করে ছাড়বে।'

মণীশ শুধোল,—'তারপর ?'

রতন জবাব দিল,—'মাঝে মাঝে ছটুলাল ভালো ব্যবহার করত। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে টিকিটটা কোথায় আছে জানতে চাইত। ওটা দিলেই আমার ছুটি। তার জন্যে কত লোভ দেখিয়েছিল।'

সোমেন বলল,—'তোর দেখছি এতটুকু ভয়-ডর নেই। লটারির টিকিটটা কোথায় আছে বলে দিলেই তোকে ছেড়ে দিত। দিব্যি বাড়ি চলে যেতিস।'

—'উহুঁ। তুমি তাহলে ওকে চিনতে পারনি।' রতন বেশ বিজ্ঞের মতো কথা বলল।—'লটারির টিকিটটা পেলে ও আমাকে দশ হাজার টাকা দেবে বলে কবুল করেছিল। কিন্তু আসলে টিকিট হাতে এলেই ও আমাকে খতম করত। এমন একটা ঘটনার তো আমি একমাত্র সাক্ষী। তাই আমাকে নিশ্চিহ্ন না করে ওর উপায় ছিল না।'

রতীশ তার পিঠে একটা হাত রেখে বলল,—'তুমি বেশ বুদ্ধিমান ছেলে দেখছি। এমনি বিপাকে পড়েও যে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছ, এই ঢের। তবে তোমার ডায়েরী পড়ে আমার কেমন

সন্দেহ হয়েছিল। কিডন্যাপ, করবার অন্য কী মোটিভ হতে পারে? তারপর ওই ছ'টা সংখ্যা দেখেই খটকা লাগল। শেষে পুষ্করে বিষ্ণু মন্দিরের পাশে ছটুলালের ভ্যারাইটি স্টোর্সের সামনে দাঁড়াতেই সন্দেহের নিরসন হল।'

—'ওর দোকানে গিয়ে আপনি কি দেখলেন?' সোমেন জিজ্ঞাসা করল।

রতীশ বলল,—'সামনে একটা নীল রঙের ফেস্টুনে বড় বড় অক্ষরে হিন্দীতে লেখা—এই কাউন্টারের টিকিটে ভাণ্ডার বাম্পার লটারির ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছে। টিকিটের নম্বর—৯৬৩৩৬৯।'

মণীশ কোমর ধরে রতনকে শূন্যে তুলে এক পাক নেচে নিল। ফের ওকে মাটিতে নামিয়ে বলল,—'টিকিটটা কোথায় রেখেছিস? এরপর বাড়ি গিয়ে সেটা খুঁজে পাবি তো?'

রতীশ অন্তর্যামীর মতো মুচকি হেসে বলল,—'টিকিটটা তো রতনের কাছেই আছে।'

—'ওমা, তাই?'—মিলন সকৌতুকে তাকাল। ফের বলল,—'ভীষণ চাপা কিন্তু তুই। জানতে পারলে ছটুলাল তোকে আস্ত রাখত না।'

—'জানবে কেমন করে?' রতন গর্বের সঙ্গে বলল,—'টিকিটটা আছে প্যাণ্টের কোমরে।'

—'কোমরে?'

—'হ্যাঁ। ব্লেড দিয়ে কাপড়টা কেটে টিকিটটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফের মেসিনে সেলাই করে নিয়েছি। কারো সাধ্যি নেই ওটা খুঁজে পায়।'

মণীশ রতনের পিঠে চাপড় দিয়ে বলল,—'ধন্যি ছেলে বাবা।'

রতীশ বলল,—'সবই তো হল। কিন্তু একটা ধাঁধা এখনও পরিষ্কার হল না যে, রতন।'

রতন অবাক। বলল,—'কোন্ ধাঁধাটা রতীশদা?'

—'তোমার ঢিলে বাঁধা চিঠিটা না পেলে আমরা কিছুতেই জানতে পারতাম না তুমি কোথায় আছ। আমাদের চিঠিটা দিলে কি করে? তুমি তো গুহার ভেতরে বন্দী ছিলে।'

রতন বলল,—'হ্যাঁ, সে একটা ব্যাপার। আমি তো গুহার ভেতরে বন্দী। আপনারা আমার খোঁজে আসছেন সেটা আমার জানার কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ ছটুলাল গুহার ভেতরে এসে আমার পাহারাদার লোক দুটির সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে পরামর্শ শুরু করল।



মণীশ রতনের পিঠে চাপড় দিয়ে বলল,—'ধন্যি ছেলে বাবা।' [পৃঃ ৭৭

আমি ওদের কথা কান পেতে শুনে বুঝতে পারলাম কলকাতা থেকে ক'জন বাবু এসেছে। ছটুলালের সন্দেহ তারা আমার খোঁজেই এসেছে। এবং এরা নাকি এই পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করেছে।

শুনে আনন্দে আমার বুকটা নেচে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে গুহার ঘুলঘুলিটা দিয়ে বাইরে তাকালাম। দেখলাম, 'হ্যাঁ সত্যি। মণীশদাকে চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি লিখে ঢিলে বেঁধে ঘুলঘুলি দিয়ে নিচে ছুড়ে দিলাম।'

সব শুনে রতীশদা বলল,—'সাবাস! তোমার উপস্থিত বুদ্ধির জোরেই তুমি রক্ষা পেলে।'

ইতিমধ্যে থানার পুলিস হাজির। ছটুলাল আর দুই সঙ্গীকে পিছমোড়া করে বেঁধে সকলে নামতে লাগল। পুষ্করে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। পুলিস অফিসার ভদ্রতা করে সেই গাড়িতে তাদের পাঁচজনকে আজমীরে পৌঁছে দিতে বলল। রতীশ নিজেই পকেট থেকে গাইড মেয়েটিকে পঞ্চাশটি টাকা দিল। মিলন, সোমেন আর মণীশ তিনজনেই বারবার বলল,—'তোমার এই সাহায্যের কথা আমরা কোনদিন ভুলতে পারব না।'

আরো চারদিন পরে ওরা বাঁকুড়ায় ফিরল। রতীশও সঙ্গে। মণীশ তাকে ছাড়েনি। বলল,—'তোমাকেও যেতে হবে। এত কষ্ট করে রতনকে উদ্ধার করলে। মেসোমশায় নিশ্চয় তোমাকে একবার দেখতে চাইবেন।'

রতনও আবদার করল,—'হ্যাঁ রতীশদা, তুমি যাবে।'

খবর পেয়ে জিপগাড়ি নিয়ে দারোগাবাবু ছুটে এল। এসেই মণীশকে বলল,—'আরে সাবাস! তোমার কেরামতি আছে। তবে স্বীকার করছি, কিডন্যাপের পেছনে যে লাখ টাকার মোটিভ আছে তা আমার মগজে আসেনি। যত কাণ্ড তো ওই প্রাইজ পাওয়া টিকিটটা নিয়ে—'

মণীশ বলল,—'হ্যাঁ, তবে টিকিটটা আমরা জয়পুরে লটারির ডিরেক্টরের কাছে জমা দিয়ে এসেছি। মাসখানেকের মধ্যেই পাঁচ লাখ টাকার চেক এসে যাবে আশাকরি।'

দারোগাবাবু বলল,—'চেক আসুক। তারপর আমাদের খাওয়া পাওনা রইল।'

—'ছি-ছি!' রতনের বাবা সলজ্জ হাসলেন।—'সামান্য খাওয়া

নিয়ে কেন বলছেন ? আমি তো ঠিক করে ফেলেছি রতনকে ফিরিয়ে আনতে যারা সাহায্য করেছে, তাদের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব।'

—'দশ হাজার !' দারোগাবাবু হাসতে হাসতে বলল,—'সে কথা মন্দ নয়। পুরস্কারটা চমৎকার একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

সোমেন বলল,—'কিন্তু মেসোমশায়, এবার আমাদের রাজস্থান দেখা হয়নি। রতনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরব বলেই আর কোথাও গেলাম না।'

মিলন বলল,—'হ্যাঁ, রাজস্থানে কত কিছু দেখার আছে। জয়-পুরের কাছে অম্বর ফোর্ট, আজমীরে খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তির দরগা আর পুষ্কর। চিতোরগড়ে রানা কুম্ভের বিজয় স্তম্ভ। তারপর হলদীঘাট, উদয়পুরের লেক, মাউণ্ট আবু—।'

মণীশ যোগ করল,—'যোধপুরে উমেদভবন নাকি দেখার মতো। আর জয়সলমীরের মরুভূমি না দেখে এলে তো রাজস্থান দেখার কোনো মানেই হয় না।'

রতনের বাবা বললেন,—'বেশ তো, সামনের বছর তোমরা দল বেঁধে ঘুরে এস। মণীশ, তুমি, সোমেন, রতন আর,'—কি যেন বলতে গিয়ে ভদ্রলোক এক মুহূর্ত থামলেন।

অমনি মিলন যেন তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করল,—'ও বুঝেছি আপনি রতীশদাকে নেওয়ার কথা বলছেন।'

—'অবশ্য।' রতনের বাবা সহাস্যে তাকালেন। রতীশকে লক্ষ্য করে বললেন,—'আসলে আপনি সঙ্গে গেলেই আমরা নিশ্চিন্ত।'

রতনের ফ্রক-পরা ফুটফুটে বোনটা কোথা থেকে ছুটে এসে বলল, —'হুঁ, আমাকে অমনি বাদ দিলেই হ'ল ? এবার আমাকে ফেলে কই তোমরা যাও দিকি ?'

রতীশের হঠাৎ সেই ছোট্ট গাইড মেয়েটির কথা মনে পড়ল। আবার পুষ্করে গেলে তার সঙ্গে নিশ্চয় একবার দেখা করতে হবে। ওর সাহায্য না পেলে রতনকে উদ্ধার করা কী এত সহজ হত ?

—শেষ—